‘আনন্দ’-স্বরূপিণী

নারায়ণ সান্যাল

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৬৫, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

প্রকাশক :

এন. চক্রবর্তী

অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

পি. কে. পাল

শ্রীসারদা প্রেস

৬৫, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

অলঙ্করণ :

লেখক

প্রচ্ছদ :

গৌতম রায়
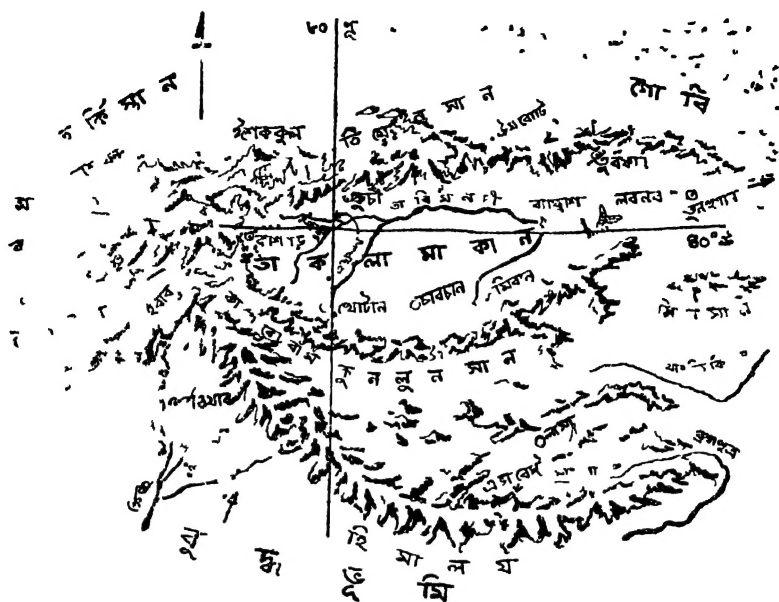
লক্ষযাত্রীর পদচিহ্নচিহ্নিত সহস্রাব্দীর মৃত্যুহীন পথ। লক্ষযাত্রীর নরকঙ্কাল লাঞ্ছিত মৃত্যুলীন পথও বটে। শুধু মহাপ্রস্থানের নয়, মহা-আবির্ভাবের কুমারস্বামী যাকে বলেছিলেন 'প্রাচীন প্রাচী', সেই উপবৃত্তাকার মহান সংস্কৃতির দুইটি মূল নাভির যোজক এই ত্রিধারাপ্রবাহিত পার্বত্যপথ,—ইতিহাস যাকে চিহ্নিত করেছে 'রেশম-সড়ক' অভিধায়। উত্তরে তিয়েনশান, দক্ষিণে কারাকোরাম ও কুনলুনশান, পশ্চিমে পামীরগ্রন্থী এবং পূবে ভয়ঙ্করী গোবি মরুভূমির দিকে অভিশাপবর্ষণদৃপ্ত দুর্বাসার প্রসারিত অঙ্গুলিসঙ্কেতের মত ইঙ্গিতবাহী বালুকাস্তূপের আদিগন্ত বিস্তৃতি। এ পথের এক পার্শ্বে অভ্রংলিহ তুষারাচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণীর ধ্যানস্তিমিত গাম্ভীর্য, অপর পার্শ্বে স্বচ্ছতোয়া তারিম নদীর প্রতি ধাবমান পাতালস্পর্শী মৃত্যুখাদ। সেই সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মে প্রস্তর-সমাকীর্ণ পাকদণ্ডীর ঘূর্ণাবর্তে অতি সাবধানে পর্বতাবরোহণ করছিল একমুষ্টি মানবশিশু। তাছাড়া সমগ্র চরাচরে প্রাণের কোনও সাড়াশব্দ নেই। না, আছে—লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নির্মেঘ আকাশের নিঃসীমায় চক্রাকারে সঞ্চরমাণ কয়েকটি বিন্দু—ওরা জীবনের সঙ্কেতবহ নয়, জীবনাবসানের দ্যোতক, শকুনি-গৃধিনীর দল। ঊষর তাকলামাকান মরুভূমি আর জনমানবহীন তিয়েনশান পর্বতের এই জনমানবশূন্য অঞ্চলে ঐ রেশম সড়কের ধারে ধারেই ওরা

পায় জীবনধারণের উপাদান—মৃত্যুর বিনিময়ে : মুমূর্ষু মানুষ, অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র!

সংখ্যায় যাত্রীদল অন্যূন দশজন। দূর থেকে ওরা আলম্ব-প্রাচীরগাত্রে সঞ্চরমাণ সারিবদ্ধ পিপীলিকার মত প্রতীয়মান হচ্ছিল বটে, কিন্তু যাত্রীদল আরও নিকটবর্তী হওয়ায় এখন ওদের সনাক্ত করা যায়। তিনজন রমণী, একজন রাজপুরুষ, অবশিষ্ট কিঙ্করশ্রেণীর—পলাঙ্কিকা-বাহক, দেহরক্ষী, পাচক ও ভৃত্য। শ্বেতবর্ণের একটি আরবীয় অশ্বপৃষ্ঠে যিনি দলের পুরোভাগে পর্বতারোহণ করছিলেন তিনিই পূর্বোক্ত রাজপুরুষ; যদিচ তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ আদৌ রাজবংশোচিত নয়। তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, অঙ্গে গৈরিক কাষায়, তদুপরি পার্বত্য অঞ্চলের শৈত্যনিবন্ধন পশমের কম্বল। কটিদেশে বিলম্বিত—না, তরবারি নয়, পশম-রজ্জুতে আবদ্ধ অক্ষোট-কাষ্ঠের একটি ভিক্ষাপাত্র। নিঃসন্দেহে তিনি একজন বৌদ্ধ শ্রমণ। বহিরাবরণে আড়ম্বরের অভাব সত্ত্বেও তাঁর দেহাকৃতিতে রাজকীয় মর্যাদার ব্যঞ্জনা—শালপ্রাংশু সমুন্নত দেহ, উজ্জ্বল গৌর গাত্রবর্ণ, চক্ষুতারকায় মধ্যএশীয় নির্মেঘ আকাশের ঘন নীলিমা। অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম আন্দাজ পঞ্চাশ, যদিও তাঁকে প্রথম দৃষ্টিতে নাতিপ্রৌঢ় বলে ভ্রম হয়। ঋজু দীর্ঘদেহ, ললাটে বা মুখাবয়বে তিলমাত্র বলিরেখাচিহ্ন নেই, আছে আত্মতৃপ্তির এক প্রশান্ত জ্যোতিঃ। বহিরাবরণে না থাকলেও তাঁর ধমনীতে আছে রাজরক্তের স্বাক্ষর।

ইনিই আমার কাহিনীর নায়ক। এঁর নাম—থাক! নাম উচ্চারণে তাঁকে পরিচিত করা যাবে না। তোমরা তাঁর নাম শোন নি। ইতিহাস তাঁর নামটি স্মরণে রাখতে ভুলেছে। এখানে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলি—তোমরা আমাকে মার্জনা ক'র। আমি ইতিহাসের ছাত্র নই। ইতিহাসচর্চা আমার সামান্যই। তবু বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় আবশ্যিক বিষয় হিসাবে আমাকে ভারতীয় ইতিহাস পাঠ করতে হয়েছিল। সে আজ সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বেকার কথা। আমার সেই ভারতীয় ইতিহাস গ্রন্থে আমার এই নায়কের নামটি পাই নি। ইদানীংকালের বি. এ. পরীক্ষার ইতিহাসের প্রশ্নপত্রগুলি অন্বেষণ করে দেখেছি, তাঁর বিষয়ে সাম্প্রতিককালে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় নি। নিঃসন্দেহে তিনি ভারতের ইতিহাসে উপেক্ষিত, অপাংক্তেয়, বিস্মৃত! সে অপরাধ ওঁর নয়; সে পাপ তোমার, সে পাপ আমার। আমি তো মনে করি : বিগত শতাব্দীর ইতিহাসে বিশ্ব-সংস্কৃতির মহাসভায় ভারতবর্ষের ধ্যান-ধারণা-ধর্মের ধ্বজাধারীরূপে যদি পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের নামটাই সর্বপ্রথমে মনে আসে তবে বিগত দ্বিসহস্রাব্দীতে যে পরিব্রাজকটির নাম স্মরণে আসা সঙ্গত, তিনিই

আমার কাহিনীর ইতিহাস উপেক্ষিত নায়ক—যাঁর নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে দ্বিধায় সঙ্কোচে মধ্যপথে থেমে পড়েছি।

স্থান, কাল আর পাত্র। প্রথমে 'স্থান', অর্থাৎ ভূগোল, তারপর 'কাল' বা ইতিহাস, সর্বশেষে 'পাত্র'—কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের পরিচয়।

প্রথমে ভূগোল। ঘটনাস্থলের অবস্থান—অক্ষাংশ ৪১° উত্তর, দ্রাঘিমাংশ ৮০° পূর্ব। ভূ-মানচিত্র অন্বেষণ নিষ্প্রয়োজন—আমাদের অবস্থান কেন্দ্রীয় রেশম-সড়কে; কুচী জনপদ ও কাশগড় নগরীর মধ্যবর্তী অংশে তাকলামাকান মরুভূমির উত্তর-সীমান্তলীন পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত তারিম নদীর উত্তর উপকূলে। বোধ করি তা সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানটার প্রকৃত ধারণা হল না। না, —পাঠকের ভূগোলজ্ঞানের প্রতি এ কোনও তির্যক কটাক্ষ নয়; বস্তুত এ গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে লেখকের নিজস্ব ধারণাও ছিল একই রূপ অস্পষ্ট, ধোঁয়াশায় আচ্ছাদিত। একমাত্র হিল্টনের 'লস্ট হোরাইজন' ভিন্ন অন্য কোনও ঔপন্যাসিকের অনুগামী হয়ে ঐ নিষিদ্ধ দিগন্ত-বিলুপ্তির অজ্ঞাত রাজ্যে কখনও পদার্পণ করেছি বলে স্মরণ হয় না। ফলে একটু বিস্তারিত আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ছে:

'প্রাচীন প্রাচী'-র দুই প্রধান প্রতিবেশী মহাচীন ও ভারত পরস্পরকে প্রথম কবে চিনল, একে অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হল সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। সরকারীভাবে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম নাকি মহাচীনে উপনীত হয় খ্রীষ্টজন্মের সমসময়ে—বক্ষু উপত্যকার একজন জনপদনায়ক নাকি চীন-সম্রাটকে খ্রীষ্টপূর্ব ২ অব্দে একটি বৌদ্ধগ্রন্থ উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কিন্তু তারও পূর্বে বুদ্ধদেবের বাণী বহন করে কোন কোন পরিব্রাজক যে চীনখণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এমন অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। চ'ঈন বংশের প্রথম সম্রাট শী হোয়াঙ তি খ্রীষ্টপূর্ব যুগেই নাকি তার রাজধানীতে একজন বিধর্মী বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারককে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হান্ বংশীয় সম্রাট উ-র একজন সৈন্যাধ্যক্ষ—'হো পুচিং' তাঁর নাম উত্তর এশিয়ার এক উপজাতিনায়কের কাছ থেকে একটি সুবর্ণ-বুদ্ধমূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন বলে লিপিবদ্ধ করেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক পানিক্কর। ঐ যুগে থেরবাদী বৌদ্ধরা বুদ্ধমূর্তি আদৌ নির্মাণ করতেন না। সুতরাং একথাই কি ধরে নেব যে, উল্লিখিত বুদ্ধমূর্তি একটি স্তূপের বিকল্প? বোধিদ্রুম-পদচিহ্ন ধর্মচক্র ইত্যাদি কোন কিছুর প্রতীক? জানি না। মোট কথা, অতি প্রাচীনকাল থেকেই চীন ও ভারত পরস্পরের পরিচয় পেয়েছিল, সখ্য-বন্ধনের

জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল দুইটি বিকল্প পথে। প্রথম সড়কটা হিমালয়ের উত্তর সীমান্ত দিয়ে বিসর্পিল স্থলপথ, দ্বিতীয়টা সমুদ্রপথ —সুবর্ণভূমি (ব্রহ্মদেশ), শ্রীবিজয় (যবদ্বীপ), কম্বুজদেশ (কাম্বোডিয়া), চম্পা (কোচিন চীন) হয়ে কান্তগড (ক্যান্টন) বন্দরে উত্তরণ। দ্বিতীয় পথটা সমুদ্রতরঙ্গভঙ্গের অনিত্যতায় পদচিহ্নরেখা রাখেনি কিছু। কিন্তু উত্তর হিমালয়ের স্থলপথ শুধু সহস্রাব্দীর যাত্রীচরণলাঞ্ছিতই নয়, নরকঙ্কাল সমাকীর্ণ, সুচিহ্নিত। সে পথের বাঁকে বাঁকে উদাসীন মহাকালের ভ্রূকুটিতে ভ্রূক্ষেপ না করে আজও দাঁড়িয়ে আছে স্মারকচিহ্ন—কপিশ, হাড্ডা, বামিহান, তুরফান থ্যিজিল, তুনহুয়ান-এর ধ্বংসাবশেষ।

চীন ও ভারতের আত্মিক মিলনের পথে একাধিক বাধা। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক রক্তচক্ষুর বাধার কথা আমি তুলছি না, বলছি প্রাকৃতিক বাধার কথাই। সে প্রতিবন্ধকতা সারির পরে সারি। যেন তিন সারি দুর্ভেদ্য প্রাচীর। চীনের দিক থেকে অগ্রসর হবার পথে প্রথম বাধার অর্ধাংশ দুরন্ত গোবি-মরুভূমি, অপর অর্ধাংশ তুষারমণ্ডিত দুরতিক্রম্য তিয়েনশান পর্বতমালা। দ্বিতীয় সারির প্রতিবন্ধকতা শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর: পশ্চিম থেকে পূর্বে যথাক্রমে—হিন্দুকুশ, পামীরগ্রন্থী, কারাকোরাম, কুন্‌লুন্‌শান, মিনশান পর্বত। এই দুই সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী অংশে আদিগন্ত বালুকাময় সমুদ্র তাকলামাকান মরুভূ। সর্বশেষ বাধা পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ অভ্রংলিহ মহা হিমালয় স্বয়ং।

তবু মানুষ হার মানেনি। নতিস্বীকার করেনি ভারত অথবা চীন। ঐ অসংখ্য প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করে তারা মৈত্রীর পথ চিনে নিয়েছে। অন্বেষণ করে জেনেছে—কোথায় আছে অধিত্যকা, উপত্যকা, পাকদণ্ডীর পথ, পার্বত্যগুম্ফা, পানীয় জল। পাথরের বুকে ঝুলিয়েছে পাষাণ সোপানের শতনরী, নদীর কটিদেশে পরিয়ে দিয়েছে ঝুলন্ত-সেতুর মেখলা,—পাছে উত্তরকাল পথভ্রষ্ট হয় তাই লক্ষ দধীচি পথের প্রান্তে ছড়িয়ে রেখে গেছে বুকের পাঁজর। তাকলামাকান মরুভূমিকেই ভূগোলের অন্তিম নিদান বলে তারা স্বীকার করেনি, ওরা খুঁজে বার করেছে মরুভূমির সমান্তরালে প্রবহমাণ প্রাণধারাকে: স্বচ্ছতোয়া তারিম নদীকে। সেই জীবনদাত্রী তারিম নদীর অববাহিকায় মানুষ গড়ে তুলেছে সারি সারি মরু-পান্থশালা, খর্জুর-সমাকীর্ণ ক্ষুদ্র জনপদে বালুকাস্তূপের গভীরে আবিষ্কার করেছে মাতৃস্তন্যের মত সুস্বাদু লুপ্ত প্রস্রবণ। গড়ে তুলেছে—মরুপান্থগৃহ, বাণিজ্যকেন্দ্র,

পার্বত্যগুম্ফার আশ্রয়ে সঙ্ঘারাম। ঐসব ক্ষুদ্র জনপদে প্রাণধারণের প্রয়োজন মেটাতে সহস্রাব্দীকাল ধরে পথ চলেছে লক্ষ লক্ষ যাত্রী—পদব্রজে, অশ্বারোহণে, অশ্বতরের পৃষ্ঠে, উষ্ট্রে। সে পথকে ইতিহাস আদর করে বলেছে—রেশম-সড়ক, বলেছে মশল্লা-পথ।

এ পথ মোটামুটি ত্রিধারায়। যেন খাইবার গিরিবর্ত্মের মুক্তবেণী শেষ-বেশ যুক্তবেণী হল চীনের প্রবেশ তোরণ: তুনহুয়ান-এ। সরস্বতী-যমুনা-গঙ্গা। প্রথম সড়কটি তিয়েনশান পর্বতের উত্তর সীমান্ত দিয়ে—সমরখন্দ, তাশখন্দ, খাকন্দ্ পার হয়ে, স্ফটিকস্বচ্ছ ঈশক্-কুল হ্রদের কিনার দিয়ে—যা ছিল চীন-ব্যাকট্রিয়া পারস্যের বাণিজ্য পথ। দ্বিতীয় পথটি তারিম নদীর অববাহিকা-আশ্রয়ী, যে পথে পড়বে কাশগড, কুচী কারাশর, তুমশুক, খিজিল, তুরফান। আর তৃতীয় সড়কটা তাকলামাকান মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর, হিমালয়ের উত্তর-তরাইয়ের কোল ঘেঁষে। সে পথও শুরু হয়েছে ঐ কাশগড জনপদে, সে-পথে পড়বে ইয়ারকং, খোটান, চারচান, মিরান,—লবনবের প্রান্ত দিয়ে সে পথও শেষ হবে মহাচীনের প্রবেশ-তোরণে ঐ যুক্তবেণীর মহান বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম তুনহুয়ান-এ।

এই তিনটি বিকল্প পথরেখা ধরেই ভারতবর্ষ থেকে চীন-ভূখণ্ডে গিয়েছিলেন অযুত-নিযুত পরিব্রাজক—কাশ্যপমাতঙ্গ, ধর্মরত্ন, কুমারজীব, বুদ্ধযশস্, বিমলাক্ষ, ধর্মক্ষেম, বুদ্ধভদ্র, গুণবর্মা, ধর্মগুপ্ত, শিক্ষানন্দ, বিনীতরুচি, বোধিধর্ম, বজ্রবোধি প্রভৃতি। যাঁদের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখে রাখতে ভুলেছে। আবার ঐ পথেই এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজকের দল: ফা-হিয়েন, হিউ-এন-ৎসান, ইং-সিঙ, যাঁরা আমাদের ইতিহাসের 'ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন'। তাই বলছিলাম, এ-পথ শুধু মহাপ্রস্থানের নয়, মহা-আবির্ভাবেরও। শুধু পরিব্রাজক নয়, এই পথ দিয়ে যাতায়াত করেছে সওদাগরের দল, নিয়ে গেছে উটের পিঠে বোঝাই দিয়ে ভারতীয় রপ্তানী-সম্ভার: লাক্ষা, মশল্লা, গজদন্ত, তৈজসপত্র, মৃগনাভি, কস্তুরী, চন্দন—আর নিয়ে এসেছে চীনখণ্ড থেকে নানাবর্ণের চীনাংশুক, ভারতীয় হিন্দু-সীমন্তিনীর জন্য চীনাসিন্দুর, ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র, জেড-পাথরের ও চীনামাটির সৌখীন সামগ্রী।

ঐ মধ্যম-রেশম-সড়কে কুচী ও কাশগডের সমদূরত্বে এ কাহিনীর পটোত্তোলন।

দ্বিতীয় কথা: কাল। ইতিহাস। সময়টা ২৯২ শকাব্দ অর্থাৎ ৩৭০ খ্রীষ্টাব্দ। আমরা আছি সেই অজ্ঞাত বন্ধ্যাযুগে, যাকে ইতিহাস বলে 'ডার্ক

এজ'। কুশান রাজবংশের গরিমা অস্তমিত, মালব ও সৌরাষ্ট্র-অঞ্চলে শক নৃপতিবৃন্দ 'ক্ষত্রপ' ও 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করে কয়েক শতাব্দী রাজত্ব করেছেন। মগধে এক নূতন রাজবংশের সূচনা হয়েছে। গুপ্ত রাজবংশের তৃতীয় নরপতি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে লিচ্ছবী রাজকন্যা কুমারদেবীর বিবাহ সেই স্বর্ণযুগে উষার আলো। গাঙ্গেয় উপত্যকায় কয়েক শতাব্দী ধরে মগধ, লিচ্ছবি, কোশল ও কাশীরাজ কোনক্রমে মাৎস্যন্যায় এড়িয়ে নামমাত্র রাজত্ব করছিলেন। তার ছুটি শক্তিশালী অংশীদার বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় নূতন যুগের সূচনা হল। আমাদের কাহিনীর কালে শিপ্রাতীরে উজ্জয়িনীতে কবি কালিদাসের হয়তো চূড়াকরণ হচ্ছে—মগধরাজ সমুদ্রগুপ্তের ত্রিংশতি বর্ষকাল রাজ্যশাসন অতিক্রান্ত হল। কিন্তু আমাদের কাহিনী যে ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে সেখানে সমুদ্রগুপ্তের নাম কেউ জানে না। সেখানে মরুভূমির ভিতর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মরুদ্যানের ন্যায় আছে কিন্তু ক্ষুদ্র জনপদ এবং তাদের শাসনকর্তা—কপিশ, নগরহার, কাশগড়, কুচী, খোটান, ইয়ারকন্দ, তুরফান, তুং-হুয়াঙ। তাঁদের রাজ্যসীমার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে উপনীত হতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তই যথেষ্ট। অবশিষ্ট ভূখণ্ডের অধীশ্বর নিয়তির মত উদাসীন আদিগন্তবিস্তৃত তাকলামাকান মরুভূমি।

আমরা যতক্ষণ ভূগোল-ইতিহাস আলোচনা করেছি ততক্ষণে ঐ যাত্রীদলের পর্বতাবরোহণ সমাপ্ত হয়েছে। ওঁরা উপনীত হয়েছেন উপলমুখর স্বচ্ছতোয়া এক পার্বত্যনদীর উপকূলে। নদী পারাপারের জন্য একটি ঝুলন্ত সেতু আছে। বৌদ্ধভিক্ষু তাঁর তিনজন সহযাত্রিণীকে নিয়ে অতি সাবধানে সেতু অতিক্রম করে পরপারে এসেছেন। বর্তমানে ভৃত্য শ্রেণীর লোকেরা একে একে মালপত্র নিয়ে নদী পার হচ্ছে। ভিক্ষু ঐ নদীর অতি সন্নিকটে উপবেশন করে লক্ষ্য করছিলেন তাদের। পুরকামিনীদিগের মধ্যে ছুইজন এতক্ষণ পল্যাকিস্কায় বাহিতা হচ্ছিলেন। সেতুটি কিন্তু তাঁদের পদব্রজে অতিক্রম করতে হল। একজন বৃদ্ধা; কুচী জনপদের নৃপতি রাজা পো-সাঙ-এর ভগ্নী। বস্তুত ঐ বৌদ্ধভিক্ষুর গর্ভধারিণী, ভিক্ষুণী জীবা। দ্বিতীয়জন তাঁর পরিচারিকা এবং রাজকন্যার বয়স্যা শ্রবণা। 'পরিচারিকা' বলা বোধ হয় ঠিক হল না, সে আদৌ বেতনভুক কিঙ্করী নয়, রীতিমত সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা। রাজ-অমাত্য শিবমিশ্রের আত্মজা। রাজপরিবারের অভ্যন্তরে আভিজাত্যের রীতি ও সংসর্গজ শিক্ষায় অভ্যস্ত হতে সেকালের এভাবে সম্ভ্রান্ত ঘরের অনূঢ়া কন্যাকে রাজাবরোধে রাখার প্রথা ছিল। শ্রবণা পরিচারিকা নয়,

বাস্তবে সে রাজকন্যার বয়স্যা। রাজকন্যাকে সঙ্গদান করতেই সে এসেছে এ দলের সঙ্গে। কুচী রাজকন্যা কিন্তু পল্যাঙ্কিকায় বাহিতা হচ্ছিলেন না—এ দীর্ঘপথ তিনি অশ্বারোহণে অতিক্রম করছিলেন। তাঁর পোশাকও পুরুষোচিত। যোদ্ধবেশ। বক্ষে লৌহজালিক পৃষ্ঠে তূণীর, কটিবন্ধে তরবারি। অশ্বটিকে নদীর কিনারে বন্ধনমুক্ত করে তিনি ফিরে এসে ভিক্ষুর অনতিদূরে এক প্রস্তরাসনে উপবেশন করলেন। তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ভদন্ত! এই স্রোতস্বিনীর নাম কি?

ভিক্ষু করলগ্নকপোলে আপন চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি রাজকন্যার সম্পর্কে জ্যেষ্ঠভ্রাতা; তবু প্রবজ্যা গ্রহণ করায় রাজকন্যা তাঁকে আত্মীয়তাসূচক সম্বোধন করতে পারেন না। ভগ্নীর কণ্ঠস্বরে তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। স্মিতহাস্যের সঙ্গে প্রত্যুত্তর করলেন, আত্মানং বিদ্ধি।

রাজকুমারী অক্ষমতীর সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার আছে। কাশগড, কুচী, খোটান অঞ্চলে ইরানীয় কথ্যভাষার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কথ্যভাষার সংমিশ্রণে এক প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত। লিপি ব্রাহ্মী নয়, খরোষ্ঠী, কিন্তু রাজকন্যা যত্নসহকারে সংস্কৃত ও পালিভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। ভাষাজ্ঞান সত্ত্বেও তাঁর প্রাকৃত প্রশ্নের এই মার্জিত সংস্কৃত প্রত্যুত্তরের অর্থ তাঁর বোধগম্য হল না। সবিস্ময়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার দিকে।

শ্রবণা বসেছিল অদূরে। তারও দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা।

রহস্যের উন্মোচন করলেন বৃদ্ধা জীবা। বললেন, অক্ষমতী! এ জলধারা তারিম নদীর একটি উপনদী। এর নামানুসারেই জন্মলগ্নে তোমার নামকরণ করা হয়েছিল। কুমার তাই রহস্য করে বলছেন, তুমি ঐ নদীর ভিতরেই নিজেকে চিনে নাও। এ স্রোতস্বিনীর নাম: 'অক্ষু'।

রাজকুমারীর চক্ষুদুটি কৌতুকে নৃত্য করে ওঠে। হঠাৎ যেন ঐ উচ্ছল স্রোতস্বিনীর সঙ্গে একটা নিবিড় আত্মীয়তা-বন্ধন অনুভব করেন। ভিক্ষু কুমারজীব বললেন, মাতৃদেবী যথার্থ কথাই বলেছেন অক্ষমতী। ঐ নদীর জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখ। তোমার স্বরূপটি দেখতে পাবে। ঐ অক্ষু নদী তোমারই মতন চঞ্চলা, তোমারই মতন বেগবতী এবং তোমারই মতন সুশীতল, তৃষ্ণানিবারিণী।

রাজকুমারী লজ্জা পান। জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট এ-জাতীয় প্রশংসাবাক্য শ্রবণে তিনি আদৌ অভ্যস্তা নন। ভিক্ষু কুমারজীব গম্ভীর, স্বল্পভাষী, অপ্রমত্ত —বোধ করি মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে, রুক্ষ-উষর মরু-অঞ্চলের মানুষ এই নদীর উপকূলে এসে কিছু উচ্ছল। কিন্তু হার মানবার মেয়ে অক্ষমতীও নয়। সঙ্কোচকে জয় করে সে বলে ওঠে, কিন্তু মহাভাগ! প্রতিবিম্ব অবলোকনের

অবকাশ কোথায়? এ দ্রুতছন্দ তটিনীর তো প্রতিবিম্ব ধরে রাখার মতো মনের স্থিরতাই নেই।

: তাতেই তো সে তোমার সঙ্গে অভিন্ন-হৃদয় হয়েছে অক্ষুমতী। কী বল শ্রবণা? পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রমণেও তোমার প্রিয়সখীর অন্তর কারও প্রতিবিম্ব ধরে রাখার মত স্থিরতা লাভ করেছে কি? নদীর আর দোষ কি?

নিঃসন্দেহে ভিক্ষু আজ প্রগল্‌ভ হয়ে পড়েছেন। কথার পিঠে কথা। এবং সে-কথায় ছিল শ্লেষ। কুচী রাজকন্যার সৌন্দর্যের খ্যাতি বৈশাখী ঘূর্ণিঝড়ে তাড়িত তাকলামাকানের বালুকাপুঞ্জের ন্যায় দ্রুতগতি ছড়িয়ে পড়েছিল মধ্য এশিয়ার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। শুধু রূপ নয়। রাজনন্দিনী অক্ষুমতী সকলকলাপারঙ্গমা। পুত্রহীন কুচীরাজ পো-সাঙ মাতৃহীনা এই একমাত্র আত্মজাটিকে তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারিণী করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। পুরুষের যোদ্ধবেশে সে সমরনায়কদিগের নিকট যথোচিত সামরিক শিক্ষা পেয়েছে—অসিবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, অশ্বারোহণ, পর্বতারোহণ। এদিকে ভাষাশিক্ষা, সঙ্গীত, কাব্য, দর্শনের চর্চাও উপেক্ষিত হয়নি। ফলে রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। ক্রমাগত বিভিন্ন জনপদ থেকে ভাটের দল কুচী রাজসভায় এসে স্ব-স্ব রাজ্যের রাজকুমারদের বীরত্বগাথা ও নানান গুণকীর্তন করে যায়। কুচীরাজ কাউকে প্রত্যাখ্যান করেননি। তিনি সকলকেই জানিয়েছেন, রাজকন্যার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হলে তিনি এক মহা-স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করবেন। রাজনন্দিনী নিজ অভিরুচি অনুযায়ী তাঁর জীবনসঙ্গীকে নির্বাচন করবেন। যতদূর জানা যায়—রাজকুমারী এখনও মনস্থির করতে পারেননি। তাই কুমারজীবের এই তির্যক ব্যঙ্গ!

শ্রবণা সসম্ভ্রমে বলল, থের! আপনার উপমান এবং উপমেয় কিন্তু অভিন্ন আত্মা নয়। বিবেচনা করুন: আগামী বৎসর মদনোৎসবে স্বয়ম্বর সভায় প্রিয়সখীর অন্তর-দর্পণে স্থায়ী ছায়াপাত ঘটবে; পরন্তু চঞ্চলা অক্ষু নদীর অন্তরে কোনদিনই কারুর প্রতিবিম্ব পড়বে না।

পঞ্চাশৎবর্ষীয় মহাস্থবিরের প্রতি একটি অনূঢ়া পঞ্চদশীর এজাতীয় বাক্-প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন—কালের মাপে আমরা আছি মধ্যযুগীয় সঙ্কীর্ণতা এবং পর্দাপ্রথার প্রাক্‌যুগে। বহির্ভারতের পুরললনা হলেও বক্তা কবি কালিদাসের অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠা। উজ্জয়িনীর নিপুণিকা-চতুরিকা

দলের পূর্বসূরী। কালের পরিমাপে ও মৈত্রেয়ী-গার্গীর কিছুটা নিকটবর্তিনী। তাই আপনার আমার কাছে যেটা প্রগল্‌ভতা বলে মনে হচ্ছে, সেটা নিতান্তই কৌতুক বলে প্রতীয়মান হল মহাস্থবিরের কাছে। তিনি পুনরায় সহাস্যে বললেন, আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না শ্রবণা। নারী ও নদী অভিন্ন-আত্মা। অক্ষুনদী আর অক্ষুমতীর তুলনা এক্ষেত্রে ত্রুটিহীন। এই নদীর স্রোতরেখা ধরে যদি চলতে থাক উপনীত হবে—বাত্রাশ-কোল হ্রদের উপকূলে। সেখানে পৌছে স্থির হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে অক্ষু। গতির বিনিময়ে সে সেখানে পাবে গভীরতা। তখন লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, তার অচঞ্চল জলে নির্মেঘ আকাশের সবটুকু নীলিমাই প্রতিবিম্বিত। নদী ও নারীর সার্থকতা ঐ মহাসঙ্গমেই। সুপ্রবুদ্ধতনয়ার সার্থকতা যেমন রাহুলমাতায়।

তর্কে পরাজয়টা সহ্য হয় না শ্রবণার—বিশেষ, মহাভিক্ষু তো আজ স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত নন, ধর্ম ও দর্শনের রাজ্য ত্যাগ করে তিনি যে স্বেচ্ছায় কাব্যের নর্মভূমে নেমে এসেছেন কৌতুক-কুতুহলে। এ কাব্যভূমে অধিকার অক্ষুমতীর, এ রাজ্য শ্রবণার। এখানে সে হার মানতে রাজী নয়। তাই পুনরায় বলে, কিন্তু থের। সুপ্রবুদ্ধতনয়ার পরিণাম কি রাহুলমাতায়? অভিধম্মে উপসম্পদা গ্রহণে নয়?

তর্কের ঝোঁকে শ্রবণা এবার স্বরাজ্য ত্যাগ করে, অন্যমনে প্রবেশ করে ফেলেছে মহাভিক্ষুর সাম্রাজ্যে। তিনি কিন্তু ক্ষুব্ধ হন না মোটেই। বলেন, তোমার এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না শ্রবণা—সেটা হবে আত্ম-অস্বীকার! তোমার সম্মুখেই সশরীরে উপস্থিত রয়েছেন এ প্রতর্কের মূর্তিমতী প্রত্যুত্তর! অগ্রবিনতা মহা-ভিক্ষুণী জীবা।

মরমে মরে যায় শ্রবণা—নিজের প্রগল্‌ভতায়!

ভিক্ষুণী জীবার জীবনেও তিনটি পর্যায়। অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি ছিলেন অক্ষুমতীর মত কুচীরাজ-প্রাসাদের এক চঞ্চলা কিশোরী রাজান্তঃপুরিকা। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি রাহুলমাতার মত সার্থক হয়েছিলেন কুমারজীবকে মাতৃস্তন্যে পুষ্ট করে।

বর্তমানে তৃতীয় পর্যায়ে তিনি কুচীনগরীর সর্বজনশ্রদ্ধেয়া মহীয়সী ভিক্ষুণী। আ-লী বিহারের অগ্রবিনতা।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভারত ভূখণ্ড থেকে কুচীরাজের দরবারে উপনীত হয়েছিলেন একজন অত্যন্ত সুদর্শন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ—ভিক্ষু কুমারায়ণ। তিনি বস্তুত ছিলেন কাশ্মীররাজার একজন অমাত্যের জ্যেষ্ঠপুত্র। পিতার দেহাবসানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে মতান্তর হল। মনান্তর হল না। কারণ বীতশ্রদ্ধ কুমারায়ণ তাঁর যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে তথাগতের শরণ নিলেন। ঘর ছেড়ে পথে নামলেন। দীক্ষা নিলেন বৌদ্ধধর্মে, হলেন পরিব্রাজক। যষ্টি এবং ভিক্ষাপাত্র সম্বল কুমারায়ণ কাশ্মীর উপত্যকা থেকে রওনা হলেন উত্তর পশ্চিমে। পেশওয়ার, কাবুল, খাইবার গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে পামীর গ্রন্থ উন্মোচন করে এলেন কাশগড় সঙ্ঘারামে। কিন্তু ভিক্ষুকের একস্থানে বেশিদিন থাকতে নেই। বর্ষা শেষ হলে এবার পূর্বাভিমুখে চলতে থাকেন কুমারায়ণ, অক্ষুনদী অতিক্রম করে এসে পৌছলেন খিজিল-সঙ্ঘারামে, অবশেষে কুচী নগরীতে। কুচীরাজ সসম্মানে তাঁকে আশ্রয় দিলেন নিজের অতিথিশালায়। তাঁকে বরণ করলেন রাজগুরুরূপে। কুচীরাজ ধর্মমতে বৌদ্ধ, বস্তুত তাঁর রাজ্যের শতকরা নব্বই জনই বৌদ্ধ। জনপদের সর্বত্র শুধু চৈত্য, বিহার, স্তূপ আর সঙ্ঘারাম। মুষ্টিমেয় কিছু হিন্দু প্রজা আছে; তাদের আছে একটিমাত্র মন্দির—প্রাগার্যসভ্যতার চিহ্নস্বরূপ জীর্ণ-প্রায় এক মদনদেবের মন্দির, তো-শান পর্বতশীর্ষে। কুমারায়ণ রাজগুরু হিসাবে সসম্মানে অধিষ্ঠিত হলেন রাজপ্রাসাদে। বৌদ্ধভিক্ষু তিনি, উপসম্পদা লাভ করে তখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি। সুতরাং মহা সঙ্ঘারামে তাঁর আবাস চিহ্নিত হতে পারে না। মহান অতিথিকে পরিচর্যা করবার দায়িত্ব অর্পিত হল রাজভগিনী কিশোরী জীবার উপর। এর পরের প্রকৃত ইতিহাস হারিয়ে গেছে; কিন্তু পরিণাম দেখে অনুমান করা যায়, মারবিজয়ীর রাজ্যে পঞ্চশর পুনরায় সফলকাম হলেন। কুমারায়ণের উপসম্পদা গ্রহণ স্থগিত থাকল; একদিন তিনি সলজ্জে স্বীকার করলেন কুচীরাজের কাছে যে, তিনি জীবার পাণিপ্রার্থী।

অপূর্ব রূপবান পুরুষ ছিলেন এই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। তদুপরি বোঝা গেল শুধু অতিথি নয়, রাজকুমারীর অন্তরেও অনুরাগ সঞ্চিত হয়েছে। এক বসন্তোৎসবে মদনপূজার অবসানে কঞ্চুকী রাজকর্ণকুহরে কিছু অনুরাগ-রক্তিম সংবাদ পেশ করে গেল। রাজা সম্মতি দিলেন। কুমারায়ণ এবং জীবা

পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তাঁদের দাম্পত্যজীবন কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাঁদেরই সন্তান এই কাহিনীর নায়ক। পিতা ও মাতার নামের অংশ বিশেষ যুক্ত করে তাঁর নামকরণ হয়েছিল 'কুমারজীব'। তাঁর জন্মের অনতিবিলম্বেই কুমারায়ণ জাগতিক বন্ধনমুক্ত হন। জীবা তখন পূর্ণ যুবতী। কুচী জনপদে এক্ষেত্রে বিধবার পুনর্বিবাহই প্রত্যাশিত ঘটনা ছিল সেকালে। জীবা সে পথে গেলেন না; তিনি তখন বাব্রাশ-হ্রদে উপনীত সার্থক অক্ষুনদীর মত স্থির অচঞ্চল। তাঁর অন্তর তখন সমস্ত নীলাকাশকে প্রতিবিম্বিত করত—তথাগত বুদ্ধের করুণাঘন দুই নয়নের মতো। সদ্যোবিধবা উপনীত হলেন কুচী সঙ্ঘারামের প্রধান অর্হৎ বুদ্ধস্বামিন্-এর কাছে। বললেন, ভগবন! সংসারে আমার বীতরাগ জন্মেছে; আমাকে উপসম্পদা প্রদান করুন।

মহাস্থবির বললেন, কল্যাণি, সংসারে তোমার বীতরাগ হয়েছে বলছ, পুত্রকে ত্যাগ করতে পারবে?

শিউরে উঠেছিলেন জীবা। বললেন, আমি আমার ভ্রম প্রণিধান করেছি ভদন্ত। না, সংসারে আমার অনীহা জন্মেনি। পুত্রকে ত্যাগ করবার প্রতিজ্ঞায় আমি তথাগতের শরণ নিতে প্রস্তুত নই।

স্মিতহাস্যে মহাস্থবির বলেছিলেন, ভ্রম তোমার ইতিপূর্বে হয়নি জীবা, এখন হল। মাতৃস্নেহকে অস্বীকার করার নির্দেশ সদ্ধর্মে নাই। দীঘঘ-নিকায় সঙ্গীতি সুত্তন্তে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং বলেছেন—চিত্তশুদ্ধির চতুর্মার্গ: মৈত্রী, করুণা মুদিতা, উপেক্ষা। মিত্রের প্রতি যে ভাব তাই হচ্ছে মৈত্রী। সদ্যোজাত সন্তান-ক্রোড়ে জননীর নিকট আর কে মিত্র? মহারাহুলোবাদ সুত্তে বুদ্ধ স্বয়ং তাঁর পুত্র রাহুলকে বলেছেন, 'হে রাহুল! মৈত্রী-ভাবনা সাধন করিবে. মৈত্রী-ভাবনায় ব্যাপাদ (বিদ্বেষ-বুদ্ধি) বিদূরিত হইবে।' সুতরাং হে কুমারজীব-মাতা! আমি তোমাকে মৈত্রীভাবনা থেকে বঞ্চিতা করতে চাই না। তোমাকে উপসম্পদা প্রদান করব এবং তুমি সপুত্র ভগবান বুদ্ধের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পাবে।

তাই হল। সন্তান ক্রোড়ে সদ্যজননী জীবা আশ্রয় নিলেন ৎ-সিয়াও লী সঙ্ঘারামে। কুচী জনপদ সীমান্তের বাহিরে। চল্লিশ লী১ উত্তর সীমান্তে। এখানেই তিনি অতি যত্নসহকারে সংস্কৃত ও পালিভাষা শিক্ষা করেন যথাক্রমে মহাযানী ও হীনযানী ধর্মগ্রন্থ পাঠের জন্য। ৎ-সিয়াও লী সঙ্ঘারামে বৌদ্ধধর্মের বাতাবরণে মানুষ হতে থাকেন কুমারজীব। অতি শৈশবকাল থেকেই কুমারজীবের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র সাত

বৎসর বয়সে তিনি সমগ্র প্রার্থনা সূক্ত ও সহস্রগাথা কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। নয় বৎসর বয়সের ভিতরেই তিনি সংস্কৃত ও পালিভাষা আয়ত্ত করেন। এই সময় নবমবর্ষীয় বালক কুমারজীব অক্ষরজ্ঞানহীন বৌদ্ধ শ্রোতাদের অভিধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। অশীতিপর মহাস্থবিরের কর্ণে এ সংবাদ পৌছালো। একদিন তিনি স্বয়ং এলেন বালকের শাস্ত্রপাঠ শুনতে। পাঠান্তে তিনি মুগ্ধ হয়ে ভিক্ষুণী জীবাকে অন্তরালে ডেকে এনে বললেন, কল্যাণময়ি আমার দৃঢ় প্রতীতি—তোমার ঐ পুত্র অলৌকিক প্রতিভা নিয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ। হয়তো সে আংশিক বুদ্ধাবতার। তুমি এই অসামান্য বালকের যথোপযুক্ত শিক্ষার আয়োজন কর। পিঞ্জরের সীমিত পরিবেশে ঐ মহাগরুড়শাবককে আবদ্ধ বেথ না। তুমি তোমাব স্বামীর দেশে চলে যাও, তথাগতের স্বরাজ্যে।

ভিক্ষুণী জীবা পথে বার হলেন অতঃপর। যে পথে কুমারায়ণ এসেছিলেন একদিন কাশ্মীর থেকে কুচীতে, সেই পথরেখা ধরেই বিপরীতমুখে তিনি এসে উপনীত হলেন ভারত ভূখণ্ডে। কাশ্মীর রাজ্যে। স্বামীর গৃহে স্থান হল না। না হোক, কাশ্মীর সঙ্ঘারামের মহাস্থবির সানন্দে আশ্রয় দিলেন কুমারায়ণের স্ত্রীপুত্রকে। এই মহাস্থবিরও ঐতিহাসিক ব্যক্তি—মহাপণ্ডিত বুদ্ধদত্ত। বস্তুত তিনি ছিলেন কাশ্মীররাজ্যের জ্ঞাতিভ্রাতা। প্রব্রজ্যা নিযে তিনি সমস্ত পার্থিব সম্পদ শতদানে বিতবণ করে আশ্রয় নিযেছিলেন সঙ্ঘের। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করলেন, বালক কুমারজীব অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী। মাত্র তিন বৎসবের ভিতব, অর্থাৎ দ্বাদশবর্ষ অতিক্রমের পূর্বেই বালক কুমারজীব মধ্যম ও দীঘঘ আগমের যাবতীয় সূক্ত কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। এই সময় ভিক্ষুণী জীবা তাঁর পুত্রকে নিয়ে পুনরায় কুচীরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। পথে তোথারিস্তানে যু-চী রাজের নির্মিত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে তিনি সপুত্র কিছুকাল বাস করেন। প্রসঙ্গত, যু চী উপজাতি হচ্ছে মধ্য-এশিয়া ও চীনের মঙ্গোলীয় জাতীর একটি মিশ্রশাখা—কুষাণরাজ কদ্‌ভিস্‌ ভ্রাতৃদ্বয় ও সম্রাট কনিষ্ক এই যু-চী জাতির সন্তান।

কুমারজীব আজন্ম ব্রহ্মচারী। বিংশতি বর্ষ বয়সে তিনি উপসম্পদা গ্রহণ করেন, অর্থাৎ সন্ন্যাস নেন। এরপর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর তিনি কুচীতেই ধর্মজীবন-যাপন করেন। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নিজ প্রচেষ্টায়। চতুর্বেদ ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, বেদাঙ্গ ও স্মৃতি, জৈনধর্ম এবং নানা জাতের ব্যবহারিক বিদ্যা—পঞ্চবিজ্ঞান, চরক, সুশ্রুত ও জ্যোতিষ-বেদাঙ্গ। ক্ষুদ্র কুচী

জনপদে এমন কোনও পণ্ডিত ছিলেন না যাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় তৃপ্ত হতে পারেন তিনি। রেশম-সড়কে যে সকল পণ্ডিতেরা যাতায়াত করেন তাঁদের ভিতরেও উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পান না। অন্তরের অন্তস্থলে যে অনুপপত্তি রয়েছে তার 'আরোগ্য' হবে কি করে? উপনিষদের ব্রহ্মলাভ এবং বৌদ্ধদের নিব্বাণলাভের মধ্যে প্রভেদ কি? উপনিষদ বলছেন, ব্রহ্ম সত্য, অজাত, অভূত, অকৃত। ধম্মপদও ঠিক ঐ কথাই বলেছেন। উপনিষদ বলছেন, তিনি অজর, অমর, মৃত্যুর অতীত। থেরী গাথাও বলছেন, 'ইদং অজরং, ইদং অজরং, ইদং অজরামরণ পদং অশোকং'। মাণ্ডুক্য এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলছেন—'ব্রহ্ম শিবং', সুত্তনিপাত্ত বললেন, 'নিব্বানং পরমং শিবং'। তাহলে বিরোধ কোথায়? তথাগতের মহাপরিনির্বাণ কি তাহলে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের ব্রহ্ম রসাস্বাদন?

স্থির করলেন পুনরায় বার হবেন পথে। হিমালয়ে অথবা তিয়েনশানের একান্ত গুহায় যাঁরা বাস করেন তাঁরা হয়তো ওঁর সংশয় নিরাকরণ করতে সক্ষম হবেন। ঠিক এই সময়েই সংবাদ পাওয়া গেল, কাশগড়ে গৌতমবুদ্ধের নিজস্ব ভিক্ষাপাত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ভিক্ষাপাত্রটি মহাপরিনির্বাণকালে শাক্যমুনি দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তম শিষ্য আনন্দকে। কাশগড়রাজ 'পু-তু' সেই ভিক্ষাপাত্রটি সংরক্ষণের জন্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেছেন। আগামী বৈশাখী বুদ্ধ-পুর্ণিমায় তিনি চৈত্য-স্তূপের গর্ভে ঐ মহামূল্য সম্পদটিকে সংস্থাপিত করতে চান। কাশগড়রাজ এজন্য সমগ্র মধ্য-এশিয়া খণ্ডের সর্বাগ্রগণ্য বৌদ্ধ-অর্হৎ মহাস্থবির কুমারজীবকে আমন্ত্রণ জানালেন। সানন্দে সম্মত হলেন কুমারজীব। ভিক্ষুণী জীবাও এ সুযোগ ছাড়লেন না। অনুগামী হলেন পুত্রের। রাজকন্যা অক্ষমতী ও তার বয়স্যা শ্রবণাও রাজ-অনুমতি নিয়ে অনুগমন করল তাঁর। কাশগড় মহাসম্মেলনে যোগ দিতে। কাহিনীর প্রারম্ভে তাঁদেরই দেখেছি আমরা অক্ষু নদীর উপকূলে।
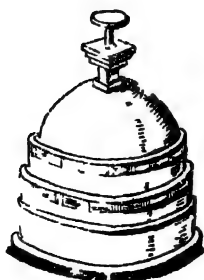
এক বৎসর পরের কথা।

কুচী নগরী আজ উৎসবের সাজে সজ্জিত। পক্ষকালব্যাপী মহা উৎসব। হর্ম্যশীর্ষে নিশান, পথে পথে তোরণ, সন্ধ্যায় গৃহে গৃহে দীপাবলী। রঙরেজিনীরা মাসাধিককাল দিবারাত্র পরিশ্রম করেছে—রাজ্যসুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ বুঝি তাদের গাত্রাবরণ নব-রঙে রঞ্জিত করতে উদ্‌গ্রীব। তাই স্বাভাবিক আসন্ন বসন্তপূর্ণিমার প্রত্যাশায় আবালবৃদ্ধবনিতার অন্তরও যে রঙিন হয়ে উঠেছে আজ—যেমনভাবে অন্তরকোরকনিবদ্ধ এক্তিম কামনা-বাসনা মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে পথবীথিকার ফুল্ল অশোক, কিংশুকে। বৎসরান্তিক মদন-মহোৎসব সমাসন্ন। কুচীরাজ্যের জনপ্রিয়তম জাতীয় আনন্দোৎসব।

মদনদেব বৌদ্ধ দেবতা নন। বস্তুত গিরিমেখলবাহন হচ্ছেন শাক্যসিংহের শত্রু। তবু এ উৎসব বৌদ্ধ কুচীরাজ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লৌকিক উৎসব। মদনদেবের এ পূজার আয়োজন শুধু প্রাক-বুদ্ধ নয়, প্রাগার্যযুগের ঐতিহ্যমণ্ডিত। মহেন জো-দারো, চান্হুদারো, হড়প্পায় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন না। মিশরে মদনাঙ্কশায়িনী রতি ছিলেন ভিন্ন নামে—হোরাস জননী দেবী আইসিস্-এর পরিচয়ে। সেকেন্দার শাহ্-এর দেশে মদন ও রতির অভিধা ছিল ডিমিটার ও আফ্রোদিতি, রোমক সভ্যতায় তাঁদের রূপান্তর ঘটেছিল—ব্যাক্কাস্ ও ভেনাস-এ। সেই নরনারীর মিলন ও প্রজননের দেবতা এশিয়া-মাইনরে এসে নূতন নামরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন—পাইরিজিয়ায় তিনি ছিলেন 'সাবাজিন', তারিম নদীর অববাহিকায় তিনিই হয়েছেন মদনদেব। গৌতম বুদ্ধ যদি এশিয়ার অনির্বাণ সূর্য, তবে প্রেম ও প্রজননের এই দেবতাও শাশ্বত-কুজ্ঝটিকা। কুজ্ঝটিকার নাগপাশ ছিন্ন করে সূর্যের আবির্ভাব যদি চিরসত্য, তবে সৌরমণ্ডলের এহ তৃতীয় গ্রহে জীবন যতদিন আছে অন্তত ততদিন এ কুজ্ঝটিকার অস্তিত্বটাও অনস্বীকার্য সত্য। কুচী নগরীর আবাল-বৃদ্ধবনিতা সে সত্যটা স্বীকার করে—কী বৌদ্ধ, কী হিন্দু। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম সঙ্ঘারামের সেই সব ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, যাঁরা মহাস্থবিরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করে যাবজ্জীবন গিরিমেখলবাহনকে অস্বীকার করেছেন। এ উৎসব পরাধর্মের নয়, দেহধর্মের। শাস্ত্রোক্ত নির্দেশানুসারে নয়, লৌকিক। আনন্দের অনাবিল উচ্ছ্বাস। বর্তমানকালে আমরা, হিন্দুরা যেমন বড়দিনের উৎসবে মাতি, অথবা খ্রীষ্টান, শিখ যুবক-যুবতী রঙ-দোলের উদ্দামতায় 'হোলী হ্যায়' উৎসবে মাতে।

এ বৎসর অবশ্য বার্ষিক উৎসবের আয়োজন অনেক ব্যাপক, অনেক বৃহৎ। তার হেতু দ্বিবিধ। প্রথমত কুচীরাজ পো-সাঙ ঘোষণা করেছেন,

মদনোৎসবের অব্যবহিত পরে রাজকন্যা অক্ষুমতীর স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন করা হয়েছে। স্বয়ম্বর-সভায় পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের নৃপতিনন্দনদিগকে আমন্ত্রণ করা অশোভন, কারণ মাত্র একজন ব্যতিরেকে অপর সকলকেই সেখানে প্রত্যাখ্যানের অমর্যাদায় মণ্ডিত করাটা অনিবার্য। কুচীরাজ তাই সুকৌশলে তাঁর রাজ্যে মদনোৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ আনিয়েছেন —অনুষ্ঠানসূচীতে স্বয়ম্বর-সভার উল্লেখ আছে মাত্র। যেন দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটা গৌণ, যে কেউ তাতে যোগ দিতে পারেন, নাও পারেন। ফলে কুচী জনপদে সমবেত হয়েছেন পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের রাজপুত্রেরা —এসেছেন অগ্নিদেশ (কারাশর), চক্কুঃ (ইয়ারকং), শৈলদেশ (কাশগড) পুরুষপুর (পেশোয়ার), নিয়া, মীরাণ, তুরফান থেকে কুমার ভট্টারক ও তাঁদের অনুজগণ। সমবেত হয়েছেন ঐ সকল জনপদের বিশিষ্ট সওদাগর ও শ্রেষ্ঠীতনয়। কুচী নগরীতে বর্তমানে এইটিই প্রধান আলোচ্য বিষয়—দেববাঞ্ছিতা রাজকন্যা অক্ষুমতী কাকে বরমাল্য দেবেন। শোনা যায়, এজন্য নগরীর শৌণ্ডিকাপণে গোপনে বাজীও ধরা হচ্ছে। জনশ্রুতি— চূড়ান্ত নির্বাচনের সম্ভাবনা নাকি মাত্র তিনজন প্রতিযোগীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ সমস্যা ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু শৈলদেশের (কাশগড়ের) রাজকুমার 'তা-মো-ফু-ত'। তিনি দুর্ধর্ষ সমরনায়ক, ধর্মের বাতিক নেই। অশ্বারোহণ ও অসিযুদ্ধে প্রোথিতযশা। চীনা ইতিহাসে তাঁর ঐ নাম উল্লিখিত বটে তবে তাঁর ভারতীয় নাম ধর্মপুত্র, পালিতে ধম্মপুত্ত। তিনি কাশগডরাজ 'পু-তু'র (ভদ্রদেবের) জ্যেষ্ঠপুত্র, যুবরাজ। ত্রিভুজের অপর দুটি বিন্দু যথাক্রমে সূর্যভদ্র ও সূর্যসোম। চক্কুক অথবা ইয়ারকং-রাজ (বর্তমান নাম 'কারগালিক') ৎ-সান কীযুনের দুই উপযুক্ত পুত্র। দুজনেই বৌদ্ধভিক্ষ —অর্হৎ কুমারজীবের দুই প্রিয় শিষ্য। উভয়েই মহাস্থবিরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—এখনও সম্মত হননি কুমারজীব। কোনও কোনও প্রাকৃতজনের বিশ্বাস জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত কুমারজীব নাকি গণনা করে দেখেছেন—এঁদের গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ অনিবার্য, সেজন্যই উপসম্পদা দান স্থগিত রেখেছেন। এ প্রসঙ্গ রাজকন্যার অন্দরমহলেও ওঠে। ওঠায় তাঁর প্রিয়সখীর দল। তারা জানতে ইচ্ছুক রাজকন্যার মনোভাবটুকু। বস্তুত রাজকন্যা এ বিষয়ে কখন কী বলেন সে কথার উপর আসবাগারে প্রতিযোগীদের বাজারদর ওঠানামা করে। শুধু রাজকন্যার প্রিয়তমা বয়স্যা শ্রবণা কৌতুহল দেখায় না। মাঝে মাঝে জনান্তিক অবকাশে অক্ষুমতীকে বলে—কী ভাষায় বলে জানি না, তবে

বর্তমান যুগের ভাষায় তার আক্ষরিক অনুবাদ: 'অহো ভাগ্য! সন্দেহাতীত বুল্‌স্‌-আই-টিপ্‌স্‌ আমার অঞ্চলপ্রান্তে গ্রন্থীনিবদ্ধ, পরন্তু আমি ভাবি মুইপ-এর ট্রিপলটোটূবঞ্চিতা।'

অক্ষমতী কৌতুক করে বলেন, বটে! তুই জানিস্‌ ভাগ্যবানটি কে?

শ্রবণা বলে, আমি তো অন্ধ নই পিয়সহি! এক বৎসরকাল তোমার সঙ্গে শৈলদেশে অবস্থান করেছি। আমি যে শুনেছি সেই পার্বত্যগুম্ফায় তোমার স্বপ্ন মঙ্গলকথা! আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি, অক্ষুনদীর চঞ্চলতা ব্যাগ্রাশ-কোন হ্রদে বিলুপ্ত হয়ে গেছে! সেখানে একটিমাত্র মুখই আজ প্রতিবিম্বিত।

রাজকুমারী হস্তধৃত পাখাদ্বারা প্রিয়সখীকে ছদ্মতাড়না করেন।

লঘুচিত্ত অনূঢ়াদিগের এ সকল হাস্যপরিহাসের কথা থাক। যে কথা বলছিলাম; এ বৎসর বার্ষিক আনন্দোৎসবের আড়ম্বর বৃদ্ধির দুটি হেতু। একটি বিবৃত করেছি; দ্বিতীয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। মহাস্থবির কুমারজীব সম্প্রতি ৎ-সাওলী মহাবিহারে একটি অতি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। প্রথম দর্শনে তাঁর ধারণা জন্মেছিল, এ-গ্রন্থ কুষাণরাজ কনিষ্কের সমসাময়িক! খ্রীষ্টপূর্ব ২ অব্দে পঞ্চনদ-দেশে জলন্ধর মহানগরীতে সম্রাট কনিষ্ক একটি ধর্মমহাসভার আয়োজন করেছিলেন, বুদ্ধচরিত-প্রণেতা মহাপণ্ডিত অশ্বঘোষের সভাপতিত্বে। সে সভান্তে সর্বাস্তিবাদিগণই স্থবির-বাদীদিগের উপর প্রাধান্য পান। অর্হৎ বসুমিত্র প্রথমোক্ত মতের সূত্রগুলি 'মহাবিভাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। সংস্কৃত ভাষায়, পালিতে নয়। প্রথমাবস্থায় কুমারজীবের ধারণা হয়েছিল, সদ্য আবিষ্কৃত গ্রন্থটি এ ঘটনার সমসাময়িক। পরে তিনি অনুধাবন করেন, এ গ্রন্থ পরবর্তীকালে রচিত। তবু এটি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র জগতে এক অনবদ্য সঙ্কলন। গ্রন্থটি: 'পঞ্চবিংশতিসাহস্রিক-প্রজ্ঞাপারমিতা'। একক প্রচেষ্টায় তিনি ঐ পুঁথির আদ্যন্ত পাঠোদ্ধার করেছেন। স্থির হয়েছে, ৎ-সিয়াওলী মহাবিহারে মদনোৎসবের অব্যবহিত পরে থের কুমারজীব সমবেত বৌদ্ধ পণ্ডিতদের ঐ অমূল্য গ্রন্থটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনাবেন। এজন্য নিকটবর্তী ও দূরবর্তী বহু সঙ্ঘারাম থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরাও ক্রমাগত সমবেত হচ্ছেন কুচীনগরীতে।

কুচী শৈলনগরী একটি পার্বত্য সানুদেশের ঢালে। সোপানবলীর মত প্রস্তরের ধাপে ধাপে হর্ম্যরাজি। প্রতিটি গৃহের ছাদ আবশ্যিকভাবে ঢালু। শীতে এখানে তুষারপাত হয়। বিশালায়তন উদ্যান কোথাও নাই। পর্বতগাত্রে 'ভুজঙ্গপ্রয়াত'-ছন্দে গ্রথিত বিসর্পিল পথ—দেবদারু, পাইন প্রভৃতি মোচাকৃতি পাদপে সমাকীর্ণ। নগরীতে একাধিক বিহার ও সঙ্ঘারাম। প্রধান বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের নাম ওয়েন-সু;

মহাস্থবির বুদ্ধস্বামিন্ এই বিহারেরই থের ছিলেন, তাঁর নির্বাণলাভে বর্তমানে কুমার-জীব থের হয়েছেন। এখানে প্রায় ষাটজন শ্রমণের বাস। তাছাড়া পো-সান পর্বতচূড়ায় চে-হু-লি বিহার এবং তা-মু বিহারেও শতাধিক শ্রবণের বাস। ভিক্ষুণী-দিগের আবাসের জন্যও ছিল একাধিক পৃথক বিহার—আ-লী এবং লিয়ুন-জো-কান সঙ্ঘারাম। ভিক্ষুণীদিগের বিহারের পরিচালনভারও মহাস্থবির 'ফু-তু-শে-মি' অর্থাৎ বুদ্ধস্বামিন্-এর উপর ন্যস্ত ছিল; বর্তমানে কুমারজীবের উপর। ভিক্ষুণী জীবা 'আ-লী' বিহারের সর্বপ্রধানা অর্থাৎ 'অগ্‌গবিনতা'। এই বিহারগুলি সচরাচর নগর কোলাহলের বাহিরে, নির্জন পর্বতচূড়ায়। নগরীর কল-কোলাহল সেখানে পৌছায় না।

এই এক বৎসরে—ঠিকই বলেছিল শ্রবণা—রাজকুমারী অক্ষমতী যেন ব্যাঘ্রাশ-হ্রদে উপনীত হয়েছেন; তাঁর অন্তর-দর্পণে অনপনেয় শাশ্বত প্রতিবিম্ব পড়েছে। আগামীকাল বসন্তোৎসব—সকলে উচ্ছল, উদ্বেল। শুধু যাঁকে কেন্দ্র করে এ আয়োজন, শুধু তিনিই বাতায়নপথে শূন্য দৃষ্টি প্রসারিত করে করলগ্ন কপোলে আত্মমগ্ন: তিনি কি এ উৎসবে যোগদান করতে আদৌ আসবেন?

তিনি অর্থাৎ শৈলদেশের রাজধানীতে দৃষ্ট সেই অনিন্দ্যকান্তি বৌদ্ধ শ্রমণ। না, তিনি কোন জনপদ-নৃপতির কুমার ভট্টারক নন—তবু বংশমর্যাদার কৌলীন্য আছে তাঁর। তিনিও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ—অপূর্ব রূপবান পুরুষ। দীর্ঘদেহী, সুগঠিত-তনু অলক্তকরাগরঞ্জিত দুগ্ধের ন্যায় যাঁর গাত্রবর্ণ, নয়ন যুগলে যাঁর দার্শনিক-সুলভ অতল জিজ্ঞাসার সঙ্গে কবিসুলভ সৌন্দর্যতিয়াসের বিচিত্র বৈপরীত্য। কাশগড়ে নৃপতির তরফে তিনিই এসেছিলেন সপরিবারে কুমারজীবকে আমন্ত্রণ করে নিতে—নগরতোরণে। সেখানেই চারিচক্ষুর প্রথম মিলন, তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গের পশ্চাৎপটে। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন রাজপুত্রী অক্ষমতী। কে জানে, হয়তো ভিক্ষু বুদ্ধযশস্‌ও।

তারপর এক বৎসর বারে বারে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে। সসম্ভ্রম সৌজন্যে একটি দূরত্ব রেখে চলেছিলেন বুদ্ধযশস্—ভিক্ষু তিনি, সদ্ধর্মের অনুশাসনে কামনা-বাসনাকে ত্যাগ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে নির্বাণলাভের পথে তাঁর অভিযাত্রা; মহাপরিনিব্বাণ-সুত্তে বর্ণিত আলাড় কালাম-এর ধ্যান-রাজ্যে তিনি উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন কাশ্মীর মহাবিহারেই। তারপর গৌতম যেমন রাজগৃহ ত্যাগ করে উরুবিল্ব গ্রামে একক-সাধনে প্রবৃত্ত হতে যাত্রা করেছিলেন, বুদ্ধযশস্‌-ও তেমনি তাঁর পূর্বসূরী কুমারায়ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে খাইবার গিরিবর্ত্ম, পামীর-গ্রন্থী অতিক্রমণে এসে উপনীত হয়েছিলেন শৈলদেশে, কাশগড়ে। উপযুক্ত গুরুর

সন্ধানে। মহাস্থবির কুমারজীব কুচী থেকে কাশগড়ে শুভাগমন করছেন শুনে তিনি তাঁর আজীবনের স্বপ্ন সার্থক হবার সম্ভাবনা দেখলেন। বুঝলেন এ ঘটনা সুনিশ্চিত-ভাবে তথাগতের নির্দেশেই। মহা-থের কুমারজীবই হতে পারেন তাঁর গুরু, তাঁর আচার্য—তাঁর নিকটেই তিনি মরজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গ্রহণ করবেন : উপসম্পদা!

কিন্তু!

কুমারজীব একাকী উপনীত হলেন না। তাঁর সঙ্গে আবির্ভূতা হলেন তাঁর ভগ্নী, দেববাঞ্ছিতা অপরূপ রূপবতী রাজকন্যা অক্ষমতী। যে চিন্তাভাবনা-কামনা-বাসনাগুলি নির্মূল হয়েছে বলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছিল, বুদ্ধযশস্ দেখলেন সেগুলি অন্তরের অন্তস্তলে সুপ্ত ছিল মাত্র—নিদাঘ খরতাপে বালুকাস্তরের নিম্নে নিদ্রামগ্ন তৃণদলের মত। যেন অক্ষুনদীর জলধারায় সেই শিশুতৃণ উষর বালুকাস্তূপ বিদীর্ণ করে অঙ্কুরিত হতে চায়, অবাক বিস্ময়ে দেখতে চায় এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎ প্রপঞ্চকে। যেন পুষ্পভারে মুঞ্জরিত হতে চায়। নিরতিশয় আন্তরিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকেন মুমুক্ষু ভিক্ষু।

বৎসরাধিককাল কুমারজীব অধিষ্ঠিত ছিলেন শৈলদেশে। তিনি মহাস্থবির, তাই তাঁর আবাস চিহ্নিত হয়েছিল মহা-সঙ্ঘারামে; ভিক্ষুণী জীবাও ছিলেন ভিক্ষুণী-দিগের জন্য নির্দিষ্ট বিহারে। পরন্তু রাজকুমারী অক্ষমতী ও শ্রবণা সংসারাশ্রমের জীব, সঙ্ঘারামে তাঁদের স্থান নির্দিষ্ট হতে পারে না; তাই তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল রাজ-অতিথিশালা। দুর্ভাগ্য বুদ্ধযশস্-এর—তিনিও ঐ রাজ-অতিথি-শালার অতিথি। উপসম্পদা গ্রহণ না করায় কোনও সঙ্ঘারামের পরিবেশে তাঁরও আবাস চিহ্নিত হয়নি। অতিথিশালাটি একটি মাত্র গৃহ নয়,—প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যানবাটিকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলি একান্ত আবাস। এক-একটি এক-একজন অতিথির জন্যে চিহ্নিত। ঐ উদ্যানবাটিকার ভিতরেও ছিল একটি ক্ষুদ্রায়তন চৈত্য। সেই চৈত্য-সংলগ্ন কক্ষে প্রস্তর-শয্যায় বুদ্ধযশস্-এর বিশ্রামের আয়োজন। চৈত্যের কেন্দ্রস্থ কক্ষে অবস্থিত বুদ্ধমূর্তিখচিত স্তূপমূলে প্রত্যহ সন্ধ্যায় তিনি পূজারতি করেন। উদ্যানবাটিকায় আশ্রয়প্রাপ্ত অতিথিবৃন্দ সমাগত হন সন্ধ্যাকালে। সমবেত প্রার্থনা-সঙ্গীতে যোগদান করেন। বুদ্ধযশস্ তাই কিছুতেই ভুলে থাকতে পারেন না তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের মূলীভূত কারণটিকে। প্রতিদিন দুই সখী যোগদান করেন প্রার্থনাসভায়। ভক্তমণ্ডলীর পশ্চাদভাগে অন্ত্যেবাসীর মত বসে থাকেন। তবু প্রার্থনান্তে বুদ্ধযশস্ যখন নিমীলিত নেত্রকে মুক্তি দেন, দেখতে পান জনারণ্যের একান্তে ঘৃতপ্রদীপের আলোকে সমুজ্জ্বল একটি দেববাঞ্ছিতা ষোড়শী মূর্তি। নীরবে সে অগ্রসর হয়ে আসে—কখনও যূথীর মাল্য, কখনও সহস্রদলের

মালিকা সশ্রদ্ধে নামিয়ে রাখে ভিক্ষুর চরণমূলে, ধাতব পাত্রে। যেন সে অর্ঘ্য তথাগতের জন্য নয়, তথাগতের সেবকের। কুণ্ঠিত হন নিত্য ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ সে অর্ঘ্য গ্রহণে।

তারপর একদিন। সেদিন সকাল থেকেই তুষারপাত হচ্ছিল। শ্যামল শষ্পভূমির উপর প্রায় বিঘৎপ্রমাণ তুষার সঞ্চিত হয়েছে। তদুপরি দুর্মদ বায়ুবেগ। সেদিন আশ্রমবাসীর কেহই সমবেত হতে পারেননি সন্ধ্যারতির সময়। ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ একাকী প্রার্থনায় উপবেশনের আয়োজন করছিলেন, সহসা চৈত্যদ্বারের রুদ্ধ কপাটে করাঘাত হল। দুরন্ত তুষারমিশ্রিত বায়ুবেগের জন্য ভিক্ষু চৈত্যদ্বার আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তিনি অগ্রসর হয়ে এসে দ্বার উন্মোচন করে দিয়েই দেখলেন, ঐ তুষারঝটিকা অগ্রাহ্য করে দুইজন ভক্ত সমবেত হয়েছেন সান্ধ্য অনুষ্ঠানে— রাজকন্যা অক্ষমতী ও তাঁর বয়স্যা শ্রবণা। তাঁদের অঙ্গাবরণে তুষারের প্রলেপ। কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন ভিক্ষু। বলেন, এই দুর্যোগে আপনারা আজ না এলেই পারতেন।

মুখরা শ্রবণা তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, এই দুর্যোগে আপনি ঘণ্টাধ্বনি না করলেই পারতেন!

সে কথা সত্য। পূজারতির পূর্বে ধাতবঘণ্টার নিনাদ প্রতিহত হতে থাকে। প্রথামাফিক বুদ্ধযশস্ সেদিনও যথারীতি ধাতব-সঙ্কেতে ঘোষণা করেছেন সন্ধ্যা বন্দনার সময় সমাগত। সংস্কৃত কাব্য পাঠ করা ছিল ভিক্ষুর। তাঁর মনে হল বৃন্দাবনের গোপনারীরা যেমন বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্র সংসারের যাবতীয় কার্য বিস্মৃত হতেন, এঁরাও তেমনি ঐ ঘণ্টাধ্বনি শুনে ছুটে এসেছেন। কিন্তু বৃন্দাবনের শ্রীরাধিকার সে অভিসারের মূলে কী ছিল? কৃষ্ণলাভের বাসনা তো বটেই। কিন্তু কী ভাবে? সে কি ইন্দ্রিয়াতীত ভগবৎ প্রেম, নাকি দেহের প্রতি রোমকূপে আত্মদানের অভীপ্সা!

ভিক্ষু বলেন, আপনাদের উভয়ের পরিচ্ছদই তুষারপাতে সিক্ত। আমি বরং একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করি।

এবারও শ্রবণা বলেছিল, মহাভাগ! শীতে অবশতনু আমার প্রিয়সখী বর্তমানে উত্তাপের কাঙ্গাল; পরন্তু অগ্নির উত্তাপে তাঁর পরিচ্ছদে সঞ্চিত তুষার দ্রবীভূত হবে এবং তাঁকে সিক্ত করে দেবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। পূজারতির আয়োজন করুন বরং।

শ্রবণার বক্তব্যে যেন কিছু গূঢ় ব্যঞ্জনা ছিল। সুতরাং ভিক্ষু সন্ধ্যারতির কার্যেই মনোনিবেশ করেন। অনতিদূরে উপবেশন করে ওরা দুইজন। শ্রবণাই পুনরায় প্রশ্ন করে, আপনি কতদিন পূর্বে কাশ্মীর ত্যাগ করে এ রাজ্যে এসেছেন ভদন্ত?

: কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর।

: আপনিও তো কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। ভিক্ষু কুমারায়ণের নাম শুনেছেন?

: নিশ্চয়। তিনি মহা-থের কুমারজীবের পিতৃদেব। বস্তুত তিনি আমার পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সে সম্পর্কে মহা-থের আমার খুল্লতাত।

: কাশ্মীরে আপনার আত্মীয় পরিজন কে কে আছেন?

ভিক্ষু ঘুরে দাঁড়ান। তাঁর প্রশান্ত ললাটে দীপালোকে ভ্রূকুঞ্চনটা স্পষ্ট। লক্ষ্য করে দেখেন—শ্রবণা প্রশ্নটি পেশ করে উধ্বর্মুখে প্রতীক্ষা করছে, পরন্তু তার সখী মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি নতমুখী। একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠে ভিক্ষু বলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুর পূর্বাশ্রম সম্বন্ধে আলোচনা নিষিদ্ধ।

কিন্তু তর্কপটু শ্রবণা অত সহজে পরাজয় স্বীকার করে না। তৎক্ষণাৎ বলে, মূঢ়মতীর প্রগল্ভতা মার্জনা করবেন, আমার ধারণা ছিল ঐ নিয়ম সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেই প্রযোজ্য। উপসম্পদা গ্রহণের পূর্বে ভিক্ষু গার্হস্থ্যাশ্রমেরই অন্তর্ভুক্ত; তখন তাঁর 'পূর্বাশ্রমে'র অর্থ গুরুগৃহের জীবন। আমি কিন্তু আপনার গুরু-গুর্বীর পরিচয় জানতে ও প্রশ্ন করিনি।

একটু উদ্ধত শোনায় ভিক্ষুর প্রতিপ্রশ্নটি, তবে কার পরিচয় জানতে চাইছেন?

: আপনার সহধর্মিণীরও নয়, যেহেতু জেনেছি আপনি অকৃতদার। আপনার পিতৃপরিচয়ই—

: আমার পিতৃপরিচয়ে আপনাদের কি প্রয়োজন?

একবচন এতক্ষণে দ্বিবচনে পরিণত হওয়ায় মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি অক্ষমতী আর নীরব শ্রোতার অভিনয় করতে পারে না। বয়স্যাকে বলে, কেন ওঁকে বিরক্ত করছিস শ্রবণা? সন্ধ্যারতির বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।

শ্রবণা নীরব হল। ভিক্ষু পূজায় বসলেন। ধূপ দীপ পুষ্পার্ঘ্য। কিন্তু নিত্য-কর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত সন্ধ্যাবন্দনায় আজ যেন সম্পূর্ণ নূতন সুর লেগেছে। ভিক্ষু যখন বর্ণগুণমণ্ডিত কুসুমার্ঘ্য প্রদান করলেন বুদ্ধের চরণমূলে তখন সহসা দুই সখী যুক্তকণ্ঠে প্রার্থনাসঙ্গীত গেয়ে ওঠেন:

"বন্ন-গন্ধ-গুণোপেতং এতং কুসুমসন্ততিং
পূজয়ামি মুনিন্দস্স সিরি-পাদ-সরোরুহে॥"

মুগ্ধ হয়ে গেলেন ভিক্ষু। সুগন্ধ সম্ভারযুক্ত ধূপদান নিয়ে যখন পূজাভাজন লোকুত্তমকে আরতি করতে থাকেন তখন দুই সখী গাইলেন:

"গন্ধ-সম্ভার-যুক্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা।
পূজয়ে পূজনেয্যন্তং পূজাভাজনমুত্তমম্॥"

স্বর্গীয় সঙ্গীতমাধুর্যে রোমাঞ্চিত হল ভিক্ষুর সর্বাবয়ব। তুলে নিলেন পঞ্চপ্রদীপ। আহ্বান করলেন তরুণীদ্বয়কে স্তূপ-পরিক্রমায় তাঁর অনুগমন করতে। তিনজনে ধীরে ধীরে স্তূপকে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন স্বর্ণপ্রদীপ হস্তে। সমবেতকণ্ঠে প্রার্থনা-সঙ্গীত সেই রুদ্ধদ্বার পাষাণকক্ষের প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে :

"ঘনসারপ্পদিত্তেন দীপেন তকধংসিনা
তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোনুদং॥"

যেন স্তূপপরিক্রমা নয়, সপ্তপদীর চক্রাবর্তন! পূজান্তে তিনজন সমবেত কণ্ঠে গাইলেন :

"মহাকারুণিকো নাথ হিতায় সব্বপাণিনং।
পূরেত্বা পারমি সব্বা পত্তোসম্বোধিমুত্তমম্॥"

বাইরে তখনও অবিরাম তুষারপাত হচ্ছে। তবু ভিক্ষু ওদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন না, নির্মমহস্তে উন্মুক্ত করে দিলেন চৈত্যের নির্গমন-দ্বার। শ্রবণা বলে, ভদন্ত, আর একটি নিবেদন আছে। আপনি যে শীত-বস্ত্রে দেহ আবৃত করেন, সেটি জীর্ণ হয়ে গেছে। পিয়সহি এজন্য আপনার ব্যবহারের নিমিত্ত একটি পশমের উত্তরীয় বয়ন করেছেন। এটি আপনি গ্রহণ করলে আমরা উভয়েই কৃতকৃতার্থ হই।

অঞ্চলতল থেকে অক্ষমতী সলজ্জে সুচারু সূচীকর্ম শোভিত পশমের একটি উত্তরীয় বার করে আনে। মিনতিপূর্ণ দুটি কজ্জল-লাঞ্ছিত নয়নে নীরবে সে প্রতীক্ষারতা।

মার! রতি-রঙ্গ-তন্হ!

জ্যা-মুক্ত শার্ঙ্গের মত ঋজু ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান হলেন বৌদ্ধভিক্ষু। অক্ষমতী নয়, শ্রবণাকে উদ্দেশ করে বললেন, বৌদ্ধভিক্ষুর বিলাসও নিষিদ্ধ, আয়ুষ্মতি। তোমার প্রিয়সখীকে বল, এ জীর্ণ উত্তরীয়ে আমার কোনও অসুবিধা নাই।

তর্কপটু শ্রবণা স্তম্ভিতা। সে যে মর্মে মর্মে জানে, ঐ কারুকার্যখচিত পশমের উত্তরীয়টি সূচীশিল্পে অলঙ্কৃত করতে তার প্রিয়সখী কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে। ঐ পশমের রক্তমুখী অম্বুজ যে রাজনন্দিনীর শ্রদ্ধা-প্রেম-প্রীতির দ্যোতক। এতক্ষণে অক্ষমতী সরাসরি সম্বোধন করেন ভিক্ষুকে। অবমানিতা রাজদুহিতা দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, প্রগল্ভতা মার্জনা করবেন ভদন্ত। আমাদের ধারণা ছিল—ভক্তের দান প্রত্যাখ্যানের অধিকার কোনও ভিক্ষাজীবী বৌদ্ধভিক্ষুর নাই। প্রদত্ত বস্ত্র ব্যবহারে যদি তাঁর রুচি না থাকে, সেক্ষেত্রে অনায়াসে তিনি তা কোনও দীন-দরিদ্রকে পুনরায় দান করতে পারেন। সঙ্ঘকে প্রদান করতে পারেন।

সেই প্রথম বুদ্ধযশস্-এর সঙ্গে সরাসরি বাক্যালাপ করলেন অক্ষমতী। বুদ্ধযশস্ কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। বলেন, আপনি যথার্থই বলছেন কল্যাণি। আপনার শ্রদ্ধার দান প্রত্যাখ্যানের অধিকার আমার নাই—

গ্রহণের মুদ্রায় দুটি হাত প্রসারিত করে দেন বুদ্ধযশস্। কিন্তু ততক্ষণে মনস্থির করেছে অক্ষমতী। বলে, মার্জনা করবেন। কীটদষ্ট অর্ঘ্যপুষ্পের মত এ প্রত্যাখ্যাত উপহার এখন দানের অযোগ্য। তাছাড়া আশঙ্কা হয় এই দুর্যোগ সন্ধ্যার স্মৃতি ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ ভুলে যেতেই আগ্রহী। সুতরাং এ প্রত্যাখ্যাত দীন উপহার আমার কাছেই থাক।

চৈত্যদ্বার খুলে তুষারঝঞ্ঝা অগ্রাহ্য করে পথে নেমেছিল অবমানিতা রাজকন্যা।

ওখানেই যদি শেষ হত ওঁদের অনুরাগ-বিরাগের আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালা, তাহলে নিশ্চয় আজ অক্ষমতী চিন্তা করত না—'তিনি কি আসবেন'? ঐ ঘটনার পরেও এই এক বৎসরে ঘটেছে আরও অনেক ঘটনা এবং দুর্ঘটনা।

সেই বৎসরাধিককাল মহাস্থবির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন ভিক্ষু সূর্যসোম, সূর্যভদ্র এবং বুদ্ধযশস্-এর সঙ্গে—শতশাস্ত্র, মধ্যমক শাস্ত্র, দীর্ঘআগম। বস্তুত সমগ্র অভিধর্মপিটক। বুদ্ধপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে সাড়ম্বরে গৌতমবুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রটির পূজাও উদ্‌যাপিত হল। ওঁর তিনজন শিষ্যই উপসম্পদা গ্রহণের কামনা জ্ঞাপন করেছিলেন। মহা-অর্হৎ বলেছিলেন, এখনও সময় হয়নি। সূর্যসোম ও সূর্যভদ্রকে তিনি কি বলেছিলেন জানা যায় না, বুদ্ধযশস্‌কে বলেছিলেন, আমার মনে হয় আপনার অন্তঃকরণ এখনও এজন্য প্রস্তুত নয়।

সলজ্জে স্বীকার করেছিলেন বুদ্ধযশস্। বলেছিলেন, প্রভু আপনি নির্দেশ দিন, কী ভাবে আমি পার্থিব কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারি!

কুমারজীব বলেছিলেন, আমি নূতন কথা কী বলব আপনাকে? এর নির্দেশ তো অভিধর্মেই রয়েছে। এর প্রত্যুত্তর আপনার অন্তঃকরণই দিতে সক্ষম। আপনার সম্মুখে পথ দ্বিধাবিভক্ত। হয় সংসারাশ্রমে প্রবেশ করে সমাজবদ্ধজীবের যাবতীয় কর্তব্য সমাপনান্তে তৃপ্ত অন্তঃকরণে তথাগতের স্মরণ নিতে হবে, অন্যথায় কৃচ্ছ্রসাধনায় ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।

বিস্মিত বুদ্ধযশস্ বলেছিলেন, সংসারাশ্রমে প্রবেশ করে! আপনি কি আমাকে

সেই নির্দেশই দিচ্ছেন মহা-থের ?

: না। আমি শুধু বলতে চাই পার্থিব কামনা-বাসনার উত্তরণ ভিন্ন উপসম্পদা গ্রহণ ব্যর্থ। এবং তা উত্তরণের দুইটি মার্গ। দ্বিধাবিভক্ত পথের কোন্‌টি অনুসরণীয় তা শুধুমাত্র আপনার বিবেচ্য।

: বিবাহিত জীবনে আবদ্ধ হওয়ার বাসনা থাকলে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করে ভিক্ষু হব কেন ?

: পার্থিব সম্পদ ত্যাগ করা সহজ। ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনাকে ত্যাগ করা কঠিনতর। ত্যাগ করবেন কি তৃপ্ত করবেন তা শুধু আপনার সিদ্ধান্তনির্ভর। তবে ভিক্ষু বুদ্ধযশস্‌! এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি—বিবাহিত জীবনকে অত ঘৃণার চক্ষে দেখবেন না। স্বয়ং তথাগত বিবাহিত জীবনের উত্তরণেই বুদ্ধত্ব লাভ করে-ছিলেন, নিব্বাণলাভ করেছিলেন। মহাজনকের অপেক্ষা সীবলীর তপস্যাকে কোন কারণেই হেয় করা চলে না।

বোধিসত্ত্ব মহাজনক ছিলেন মিথিলার নৃপতি। রাজমহিষী সীবলীকে ত্যাগ করে যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তখন অবমানিতা পরিত্যক্তা পট্টমহিষীও কঠিন তপস্যায় বৃতা হয়েছিলেন। অভিমানিনী রাজমহিষীর তপশ্চারণের একটি মাত্রই লক্ষ্য ছিল—সন্ন্যাসী মহাজনকের পুত্রকে জঠরে ধারণ করা! মহাজনক স্বয়ং বোধিসত্ত্ব, তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন—ফলে তাঁর সন্তান হওয়ার অর্থ তাঁর ব্রতচ্যুতি ধর্মচ্যুতি ; কিন্তু রাজমহিষীর বক্তব্যও ছিল সহজ সরল : সন্তানবতী হওয়াও নারীর ধর্ম— তাঁর ধর্মাচরণে বাধা দেওয়ার অধিকারও নেই মহাসন্ন্যাসী বোধিসত্ত্বের। আশ্চর্য কাহিনী! সাধনায় উভয়েই সফলকাম হন। সেজন্মে নয়, পরজন্মে। মহাজনক জন্মগ্রহণ করেন কপিলাবস্তুতে, শাক্যকুলে, শাক্যসিংহরূপে। সীবলী সে জন্মে আবির্ভূতা হলেন সুপ্রবুদ্ধতনয়া যশোধারার মূর্তি পরিগ্রহ করে। এই নবজন্মে মহাজনক গোতম-বুদ্ধরূপে মহাপরিনির্বাণ লাভ করলেন বটে, কিন্তু মাতৃস্বরূপিণী সীবলীর মাতৃত্বের দাবী পুরোপুরি মিটিয়ে দেবার পূর্বে নয়। মহাভিক্ষু রাহুল মহাভিক্ষুণী সীবলীর তপস্যার ফলশ্রুতি!

অক্ষমতীর উপহারটি প্রত্যাখ্যান করার পর থেকে ভিক্ষু বুদ্ধযশস্‌ নিরন্তর অন্তরবেদনায় পীড়িত। এর পরেও অক্ষমতী ও প্রবণা যথারীতি উপস্থিত হত সান্ধ্যপ্রার্থনা সভায় ; কিন্তু অক্ষমতী ভিক্ষুকে সম্বোধন করে আর কোনদিন কোন কথা বলেনি। এজন্যও মর্মাহত হয়েছিলেন বুদ্ধযশস্‌।

এরপর কুমারজীব স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হলেন। কুমারজীবকে বিদায় জানাতে এল কাশগড়ের আপামর জনসাধারণ। স্বয়ং মহারাজ ভদ্রদেব

এবং কুমার ভট্টারক ধম্মপুত্র। এই সময় সহসা বুদ্ধযশস্ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তিনিও ওঁদের অনুগমন করবেন। ভিক্ষুর পক্ষে একস্থলে দীর্ঘদিন অবস্থান করা বাঞ্ছনীয় নয়—তাতে স্থানীয় মমত্ববোধ জন্মে, ভিক্ষু পরিব্রাজককে নিরাসক্ত থাকতে হয়। বুদ্ধযশস্ দুই বৎসর আছেন শৈলদেশে, সুতরাং তাঁর এই সংকল্পকে স্বাভাবিক-ভাবেই গ্রহণ করলেন শৈলদেশরাজ ভদ্দদেব। মহাসমারোহে তাঁদের বিদায় জ্ঞাপন করে গেল শৈলদেশবাসীরা রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত অনুগমন করে।

এই প্রত্যাবর্তনের পথে—চৈনিকসূত্রে-প্রাপ্ত ইতিহাসে জানা যায়, কুমারজীব প্রথমে 'ওয়েন-সু'-র রাজ্যে উপনীত হন। 'ওয়েন-সু'-র সংস্কৃত নাম 'উচ্চ-তুরফান'। এখানে কুমারজীব তাও-পন্থী এক চৈনিক মহাপণ্ডিতকে তর্কে পরাভূত করে তাঁকে স্বধর্মে ও সদ্ধর্মে দীক্ষিত করেন বলেও চৈনিক ইতিহাসে লিখিত আছে। কুচীরাজ পো-সাও স্বয়ং এই তর্ক মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সভান্তে অর্হৎ কুমারজীবকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তার পূর্বে এই প্রত্যাবর্তনের পথে কিছু ঘটে, যার উল্লেখ ইতিহাসে নেই, অথচ যা আমাদের কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য :

প্রত্যাবর্তনের পথেও দুইটি পল্যঙ্কিকা ছিল—ভিক্ষুণী জীবা ও শ্রবণার জন্য। এবার অশ্বারোহী তিনজন। বুদ্ধযশস্‌ও অশ্বারোহণে অতিক্রম করছিলেন এ পথ। কুমারজীব সর্বক্ষণই জননীর পল্যঙ্কিকার সন্নিধানে ধীরগতিতে অশ্বচালনা করতেন ; অপর পক্ষে প্রতিদিনই অপর দুইজন অশ্বারোহী ক্রমশঃ পদাতিকদের পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে যেতেন। এরূপ ক্ষেত্রে নির্জন পার্বত্য-পথে দুইজনের মধ্যে কথোপকথন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মুক্ত প্রকৃতিরও একটি মোহজাল বিস্তারের ক্ষমতা আছে—বদ্ধপ্রাচীরের চতুঃসীমায় যে সঙ্কীর্ণতা মানুষের মনটাকে শম্বুকবৃত্তিতে প্ররোচিত করে—ধ্যানগম্ভীর তুষারমৌলী পর্বতের ভুজঙ্গপ্রয়াত-পথে নিঃসীম নীলাকাশের চন্দ্রাতপতলে মনের সেই অর্গল আপনিই সরে যায়। প্রথম সুযোগেই তাই বুদ্ধযশস্ সঙ্গিনীকে বলেছিলেন, কুমার ভট্টারিকা, আপনার কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি। প্রথম দিন আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিলাম আমি। আমাকে মার্জনা করবেন।

ভ্রূবিলাসাভিজ্ঞা অক্ষমতী বলে, এ-কথা কেন বলছেন ভদন্ত ?

: আপনি সেদিন যথার্থ কথাই বলেছিলেন। ভিক্ষু হিসাবে কোন দান প্রত্যাখ্যানের অধিকার আমার নেই, ছিল না।

অক্ষমতী নীরবে অশ্বচালনা করতে থাকে। বুদ্ধযশস্ পুনরায় বলেন, আপনি কি আমাকে মার্জনা করতে পারেন না ?

: বারম্বার মার্জনার প্রসঙ্গ তুলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনি সব দিক থেকেই আমার শ্রদ্ধাভাজন। এতে আমার অপরাধ হয়।

: তাহলে আপনি যে সেদিনের সেই তিক্ত স্মৃতিটুকু স্মরণে রাখেননি, তার প্রমাণস্বরূপ সেই পশমোত্তরীয়টি আমাকে দান করুন। আপনার সে শ্রদ্ধার দান—

দিগন্তে নিবদ্ধদৃষ্টি অক্ষুমতী অস্ফুটে বলে, মার্জনা করবেন মহাভাগ। তা হবার নয়, হয়তো আপনিই সেদিন যথার্থ কথা বলেছিলেন। দান প্রত্যাখ্যানের অধিকার আপনার যেমন ছিল না, তেমনি দান করবার অধিকারও ছিল না আমার।

বিস্মিত ভিক্ষু বলেন, এ কথা কেন বলছেন রাজনন্দিনী?

: মহাভিক্ষুকে দান করতে হলে শুধুমাত্র শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তেই তা করতে হয়।

: আমাকে কি আপনি শ্রদ্ধা করতে পারছেন না? সেটাই কি বাধা?

একটু নীরব থাকেন অক্ষুমতী। তারপর বলেন, না, অনৃতভাষণ করতে পারব না। হয়তো শ্রদ্ধার অতিরিক্ত আর কিছু সেদিন আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছিল আপনার জন্য ঐ কারুকার্যখচিত উত্তরীয়টি নির্মাণে। বাধা যে কোথায় তা আমি ব্যক্ত করতে পারব না, মহাভাগ। আমাকে মার্জনা করবেন।

মূক হয়ে যেতে হয়েছিল ভিক্ষুকে।

কিন্তু মূক হয়ে তো প্রতিদিন পথ অতিক্রম করা যায় না। তাই এ প্রসঙ্গ সুকৌশলে এড়িয়ে দুজনে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন। নানান গল্প—বাল্যের, কৈশোরের, নানান তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা। অবশিষ্ট যাত্রীদল অধিক দূরে পিছিয়ে পড়েছে মনে হলে ওঁরা পথপার্শ্বে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে বসেন। অশ্ব দুটিকে বন্ধনমুক্ত করে অপেক্ষা করেন। একদিন ঐরকম মধ্যাহ্ন অবকাশে অক্ষুমতী তার পৃষ্ঠে আবদ্ধ পেটিকা থেকে কয়েকটি খর্জুর ও পৌলিক-পিষ্টক বাহির করে দিতে গেল ভিক্ষুকে। বুদ্ধযশস্ হেসে বললেন, এই জনমানবহীন দেশে পৌলিক-পিষ্টক কোথায় পেলেন?

কটাক্ষ করে অক্ষুমতী বলে, প্রশ্নটা অবৈধ—'রাজারা মাণিক্য কোথায় পায়' এ প্রশ্নের মত।

ভিক্ষু বলেন, আপনি ঐন্দ্রজালিক হতে পারেন, কিন্তু এজাতীয় রাজভোগ্য বস্তুতে আমি ক্রমশ না অভ্যস্ত হয়ে যাই আশঙ্কা সেটাই।

অক্ষুমতী বলে, অভ্যস্ত হলেই বা ক্ষতি কি? সামান্য কয়েকটি পৌলিক-পিষ্টক প্রতিদিন আপনার সেবায় অর্পণ করার মত ক্ষমতা আছে কুচীরাজনন্দিনীর। যতদিন কুচীতে থাকবেন, ততদিন না হয় এ দায়িত্ব আমিই নিলাম।

: কিন্তু কুচী নগরীতে চিরস্থায়ী বসবাসের কোন বাসনা তো আমার নেই!

: থাকলেই বা ক্ষতি কি? কুচী এক অপরূপ শৈলনগরী। একজন্ম বাসে তার মাধুর্য ম্লান হওয়ার নয়।

ভিক্ষু বলেন, সেটাই তো আমার আশঙ্কা রাজকুমারী। আমিও না শেষ পর্যন্ত আমার পিতামহ কুমারায়ণের মত কুচীতেই বন্দী হয়ে পড়ি।

অক্ষমতী বলে, এখানে কিন্তু ভুল হল আপনার। ভিক্ষু কুমারায়ণ কুচীতে আদৌ বন্দী হননি—এখানে এসে তিনি মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন।

: কিন্তু উপসম্পদা নেওয়া হয়নি তাঁর!

: তাতে কি? লক্ষ ভিক্ষু উপসম্পদা গ্রহণ করেছেন—ইতিহাস তাঁদের স্মরণে রাখবে না; কিন্তু ভিক্ষু কুমারায়ণ চিরজীবী হয়ে থাকবেন ইতিহাসে—শুধুমাত্র মহাস্থবির 'কুমারজীবের জনক' এই পরিচয়ে।

: কিন্তু ইতিহাসে শাশ্বত আসন লাভেই তো মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয় কুমার ভট্টারিকা। পরম লক্ষ্য 'নিব্বাণ', তথাগতের আশীর্বাদলাভ।

অক্ষমতী বলে, রাজা শুদ্ধোদন উপসম্পদা গ্রহণ করেননি, তবু অন্তিমকালে গোতম দিব্যদেহে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়েছিলেন। আশীর্বাদে ধন্য করে-ছিলেন তাঁকে। তথাগতের গর্ভধারিণী মায়া দেবী ভিক্ষুণী ছিলেন না, তবু তাঁকে সদ্ধর্মের বাণী শোনাতে গোতমকে সশরীরে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে যেতে হয়েছিল, নয় কি?

ভিক্ষু বলেন, আপনার সঙ্গে তর্কে জয়লাভ সম্ভবপর নয়, কুমার ভট্টারিকা।

অক্ষমতী সলজ্জে বলে, আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ। আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন।

সহসা চমকিত হন ভিক্ষু। আত্মস্থ হন। বলেন, মার্জনা করবেন রাজকন্যা, সে আমি পারব না।

অক্ষমতী জানতে চায় তার হেতুটা; কিন্তু তৎপূর্বেই পর্বতান্তরালের পথে দেখা গেল পল্যঙ্কিকাবাহীরা আবির্ভূত হয়েছে।

তারপর একদিন। সেদিনও প্রত্যুষে ওঁরা দুজন অশ্বপৃষ্ঠে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এসেছেন। বেলা দ্বিপ্রহর। খাদ্যদ্রব্যাদি পশ্চাৎবর্তীদের নিকট গচ্ছিত আছে। অগত্যা ওঁরা দুইজন সেই জনশূন্য পথের প্রান্তে বসে পড়েন—যথেষ্ট দূরত্ব রেখে। অশ্বদুটিকে যথারীতি বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছেন। ক্লান্তদেহে দুজনে প্রস্তর-শয্যায় উপবেশন করেছেন কি করেননি—প্রবলবেগে আন্দোলিত হয়ে উঠল ভূলোক-দ্যুলোক। পরমুহূর্তেই দিগন্ত প্রকম্পিত করে এক প্রচণ্ড সিংহনাদ শ্রুত হল—যেন পর্বতের আত্মা মথিত করে লক্ষকোটি প্রেতযোনি শতাব্দীর রুদ্ধ হাহা-কারকে মুহূর্তে মুক্তি দিল। বিশালকায় প্রস্তরখণ্ড সশব্দে পর্বতচূড়া থেকে ভীমবেগে নেমে আসছে। ভূকম্পন! অক্ষমতী দণ্ডায়মান হবার একটি ব্যর্থ চেষ্টা করে;

ভারসাম্য রক্ষায় অসমর্থ হয়ে সবেগে লুটিয়ে পড়ছিল খাদে, কালবিলম্ব না করে ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ উঠে দাঁড়ালেন এবং সবলে আলিঙ্গন করে ধরলেন বেপথুমান নারী-দেহ। বললেন, দাঁড়াবার চেষ্টা করো না অক্ষুমতী। ভূমিকম্প হচ্ছে।

অক্ষুমতীর সমস্ত মুখাবয়বে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই। প্রকৃতির এই ভীষণারূপ সে কখনও দেখে নাই। নিশ্ছিদ্র পাষাণগাত্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভীমবেগে প্রস্তরচূর্ণ মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পরমুহূর্তেই পাতালস্পর্শী খাদের দিকে সশব্দে গড়িয়ে পড়ছে। কর্ণপটাহবিদারী ভয়ঙ্করী শব্দে সমস্ত আকাশবাতাস দলিত-মথিত। যেন পাতালবাসী বন্ধনমুক্ত লক্ষ-শীর্ষ নাগিনী তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে ধেয়ে আসছে।

সময়ের পরিমাপ নিশ্চিহ্ন। সম্বিৎ ফিরে এল যখন তখন অক্ষুমতী অনুভব করল সে ভিক্ষু বুদ্ধযশস্-এর কবাটবক্ষে দৃঢ়আবদ্ধ। মুহূর্তের তাণ্ডবনৃত্য সমাপ্ত করে উন্মাদিনী পৃথিবী আবার শান্ত হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বুদ্ধযশস্ ওকে শুইয়ে দেন ভূশয্যায়। বলেন, তোমার আঘাত লাগেনি তো কোনও?

কী প্রত্যুত্তর করবে অক্ষুমতী? দেহে তার কোন আঘাত লাগেনি—কিন্তু হৃদয়ে? মুহূর্তমধ্যে এ কী কাণ্ড হয়ে গেল!

ভিক্ষু চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, সমস্ত ভূ-প্রকৃতিটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পার্বত্য-পথটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

তাই তো! তাহলে কুমারজীব কেমন করে এখানে এসে পৌছাবেন? পথ-রেখা যদি না থাকে তাহলে কেমন করে ওঁরা মিলিত হবেন দলের সঙ্গে? দুরন্ত ভয়ে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়েন অক্ষুমতী। ভিক্ষু এতক্ষণে আত্মস্থ হয়েছেন। বলেন, আপনি বিচলিতা হবেন না রাজকুমারী। আমি তো রয়েছি। ব্যবস্থা কিছু হবেই। কুচী নগরী এখান থেকে এক দিনের পথ মাত্র। আমরা কল্য সন্ধ্যাকালের মধ্যে সেখানে নিশ্চয়ই উপনীত হব। ওঁরাও কোন ঘুরপথে সেখানে উপনীত হবেন। আসুন, দিবাভাগে যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়—

অশ্ব দুটি? তাদের চিহ্নমাত্র নাই। বন্ধনমুক্ত অশ্বদ্বয় যে স্থানে বিচরণ করছিল সে স্থানটায় একটা অতলস্পর্শী গহ্বর।

কাহিনী দীর্ঘতর করা নিষ্প্রয়োজন। সেই উপলবন্ধুর পার্বত্যপথে ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ অগ্রসর হতে থাকেন তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে। নারীদেহ স্পর্শ করবেন না বলে যে প্রতিজ্ঞা ছিল অনায়াসে বিসর্জন দিলেন তা। দুরতিক্রম্য বহুস্থানে সযত্নে অক্ষুমতীর পদ্মকোরকতুল্য হস্তধারণপূর্বক অগ্রসর হতে থাকেন।

ক্রমে ঘনিয়ে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। ভিক্ষু বললেন, এখন কৃষ্ণপক্ষ। তা-ছাড়া রাত্রে দুরন্ত শীত পড়বে। তুষারপাতও হতে পারে। রাত্রের জন্য সূর্যালোক

স্তিমিত হওয়ার পূর্বেই কোন নিরাপদ পার্বত্যগুম্ফা অন্বেষণ করে নেওয়া ভাল।

সূর্যাস্তের পূর্বেই অমন একটি পার্বত্যগুম্ফা পাওয়া গেল। আশ্চর্য! সে গুহার ভিতর মনুষ্যবাসের চিহ্ন বিদ্যমান। ভিতরে একটি হরিণচর্মের অজিনাসন, একটি কমণ্ডলু, যষ্টি এবং দু'একটি মৃত্তিকানির্মিত তৈজস—এক পার্শ্বে একটি নাতিবৃহৎ মৃৎপাত্রে পানীয় জল সঞ্চিত—এমন কি একটি অগ্নিকুণ্ডে স্তিমিত অগ্নির চিহ্নও বর্তমান। গৃহস্বামী অনুপস্থিত। ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ বলেন, তথাগতের অসীম করুণা। এ গুহা সন্দেহাতীতরূপে কোন নির্জনবাসী সন্ন্যাসীর। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন—কোন্ ধর্মাবলম্বী জানি না, কিন্তু অতিথি সৎকারে তিনি পরাঙ্মুখও হবেন না নিশ্চয়।

তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব-সম্ভাবনায় অক্ষমতীও উৎফুল্ল হয়। বস্তুত সম্পূর্ণ নির্জনে ঐ ভিক্ষুর সঙ্গে একই গুম্ফায় রাত্রিযাপনে সে সাহস পাচ্ছিল না। সাবলীই কি তৃপ্ত হত সেজন্যে ব্রাত্য সন্ন্যাসী মহাজনকের সন্তান গর্ভে ধারণ করতে সক্ষম হলে?

বুদ্ধযশস্ কিছু শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ করে আনেন—রাত্রে শীত রোধের আয়োজন।

ইতিমধ্যে অক্ষমতী অজ্ঞাত গৃহস্থের রত্নভাণ্ডারটি অনুসন্ধান করে দেখেছে। উদ্ধার করেছে কয়েকমুষ্টি চণক, গোধূম ও চিপিটক, গুটিদশেক শুষ্ক খর্জুর। লুণ্ঠিত সম্পদ সে নিয়ে আসে বুদ্ধযশস্-এর সম্মুখে। বলে, মহাভাগ, মূঢ়মতী নারী আপনার নিকট শাস্ত্রীয় বিধান সন্ধানে সমাগত। বিধান দিন, গৃহস্থের অনুপস্থিতিতে ক্ষুধার্ত অতিথি কি তাঁর ভাণ্ডার লুণ্ঠন করতে পারে?

ভিক্ষু বলেন, পারে। অতিথি যদি নারী হয়। বিশেষ, যদি রাজনন্দিনী হয়।

কিন্তু সেই রাজনন্দিনী যদি প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকে, তার সঙ্গীকে ক্ষুধার্ত রেখে সে একাকী কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করবে না?

হাসেন ভিক্ষু। বলেন, সেক্ষেত্রে গৃহস্থের জন্য কিছু আহার্য অবশিষ্ট রেখে অতিথিরা আত্মসৎকার করতে পারে। যেহেতু রাজধানী এস্থল থেকে এক দিবসের পথ। যে ঋণ আমরা গ্রহণ করেছি তা কল্যই পরিশোধ করতে পারব।

সুতরাং সম্পূর্ণ উপবাস করতে হল না। ভিক্ষু বললেন, একটা কথা। এস্থলে বন্যজন্তু আছে। দেখুন, সন্ন্যাসী গুহামুখ বন্ধ করার জন্য একটি কপাটও নির্মাণ করেছেন।

অক্ষমতী বলে, হয়তো শীত নিবারণের জন্যই এ আয়োজন।

: সম্ভবত নয়। কারণ সেক্ষেত্রে ঐ কপাটটি ভিতর হতে অর্গলবদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকত না। এ সন্ন্যাসীর গৃহে এমন কিছু নেই যে, তস্করাদির জন্য এ সাবধানতা অবলম্বন করবেন তিনি।

ঘনীভূত হল রাত্রি। বাহিরে নীঃন্ধ্র অন্ধকার। শুধু নির্মেঘ আকাশে অতন্দ্র প্রহরায় লক্ষ লক্ষ তারকা। যেন এ কোন পার্বত্য গুম্ফা নয়—এ কোন নির্জন বাসর-শয্যা। নায়ক ও নায়িকা কীভাবে তাদের প্রথম পুষ্পহীন ফুলশয্যা-রাত্রি উৎযাপন করে, সেই বারতার সন্ধানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র-দিব্যাঙ্গনা কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে প্রতীক্ষারতা।

অক্ষুমতী নানান ক্ষাত্রবিদ্যায় অভ্যস্তা, তবু আজকের দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে। ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে।

ভিক্ষু বললেন, রাজকুমারী, আমার আশঙ্কা হচ্ছে সন্ন্যাসী ভূকম্পনের সময়ে বাহিরে ছিলেন এবং তিনি দুর্ঘটনায় নিহত। নাহলে এই শীতে এক প্রহর রাত্রি পর্যন্ত তিনি বাহিরে থাকতেন না।

এ আশঙ্কা অক্ষুমতীরও হয়েছিল। বললে, এই অন্ধকারে তাঁর অন্বেষণ করবার চেষ্টা নিরর্থক। নিশাবসানে অনুসন্ধান করে দেখা যাবে।' এবারে আমরা বরং শয়নের আয়োজন করি। আমার পৃষ্ঠসংলগ্ন পেটিকায় সেই উত্তরীয়টি আছে। আমি সেইটি প্রস্তরশয্যায় বিছিয়ে নিই ; আপনি সন্ন্যাসীর মৃগচর্মটি গ্রহণ করুন।

বুদ্ধযশস্ অগ্নিকুণ্ডে কিছু কাষ্ঠ নিক্ষেপণে ব্যস্ত ছিলেন। অক্ষুমতীর দিকে দৃক্‌পাত না করে বলেন, না। এ গুহার ভিতর আপনি একাকীই শয়ন করবেন। আমি গুহামুখে ঐ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে থাকব।

: সে কি! ওখানে শয়নের উপযুক্ত যথেষ্ট স্থানই তো নাই।

: না থাক, উপবেশনের পক্ষে প্রকোষ্ঠটি যথেষ্ট।

: কিন্তু তার কি প্রয়োজন আছে? আপনি গুহামধ্যে রাত্রিবাস করলে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না।

ভিক্ষু নীরবে অগ্নিকুণ্ডে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করে চলেন। প্রত্যুত্তর করেন না। অক্ষুমতী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে থাকে ভিক্ষুকে। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে বলে, মহাভাগ, আমার প্রগল্‌ভতা মার্জনা করবেন—জানি নারী নরকের দ্বার, কিন্তু নারী হলেও আমি মানুষ! শপথ করছি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার গাত্রস্পর্শ করব না।

জ্যা মুক্ত শার্ঙ্গের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান ভিক্ষু বুদ্ধযশস্। বলেন: ক্ষান্ত হও অক্ষুমতী। এভাবে অপমান করো না আমাকে!

: অপমান! আমি? আপনাকে! কী বলছেন আপনি?

: তুমি কি করে ভাবতে পারলে—আমি তোমাকে অত নীচ ভাবি?

: তাহলে গুম্ফার ভিতর রাত্রিযাপনে আপনার আপত্তি কোথায়?

অধোবদন হন বুদ্ধযশস্। জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে

অস্ফুটে বলেন, তোমাকে নয় অক্ষুমতী, আমি নিজেকেই আজ বিশ্বাস করতে পারছি না। কারণটা ঐ একই। ভিক্ষু হলেও আমি মানুষ।

দুই হস্তে মুখ আবৃত করে ভূশয্যায় বসে পড়ে অক্ষুমতী। এর কী প্রত্যুত্তর ?

লাজকুণ্ঠিতা ঐ অপরূপ রূপবতীর দিকে নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ভিক্ষু। সান্ত্বনা দিতে ওর মস্তকে হাতখানি রাখতেও সাহস পান না। আত্মগতভাবে অস্ফুটে বলেন, আমাকে মার্জনা কর, অক্ষুমতী। আমাকে বাহিরেই রাত্রিযাপন করতে হবে। নাহলে হয়তো ভিক্ষু কুমারায়ণের মত আমাকেও...

বাক্যটা অসমাপ্ত রেখেই তিনি দ্রুতগতি গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

পাষাণচত্বরে লুটিয়ে পড়ে মন্দভাগিনী রাজনন্দিনী। উচ্ছ্বসিত রোদনে সিক্ত হয়ে যায় সে পাষাণ-কুট্টিম। তারপর উঠে বসে। উপায় নেই। এ কথার পর সে নিজেও আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে। ধীরে ধীরে সে রুদ্ধ করে দেয় পার্বত্যগুম্ফার একমাত্র দ্বার।

একদণ্ড পূর্বে ক্লান্তিতে তার আঁখিপল্লব নিমীলিত হয়ে আসছিল। এখন কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা এল না। অগ্নিকুণ্ডের সান্নিধ্যে উষ্ণ গুহাভ্যন্তরে সে নিশ্চিন্ত, অথচ দুরন্ত শীতে ঐ মুমুক্ষু একা বসে আছেন গুহাদ্বারে। অনেক রাত্রে সে গুহাদ্বার উন্মোচন করে বাহিরে আসে। নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রহর গনছে। গুহাদ্বারের এক প্রান্তে পাষাণগাত্রে দেহভার ন্যস্ত করে আড়ষ্ট ভঙ্গিমায় ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ গাঢ় নিদ্রাভিভূত। করুণায়, মমতায় আপ্লুত হয়ে গেল অক্ষুমতীর অন্তঃকরণ। আর দ্বিধা নাই; অসঙ্কোচে সে একটি রক্তশতদলখচিত পশম উত্তরীয় জড়িয়ে দেয় ঘুমন্ত মানুষটির অঙ্গে। আর কিসের সঙ্কোচ ? উনি তো নিজমুখেই স্বীকার করেছেন—উনি শুধু ভিক্ষু নন, উনি মানুষ! অস্ফুটে মন্ত্রোচ্চারণের মত অক্ষুমতী মনে মনে বলে, ঘুমাও তরুণ তাপস! এ হৃদয় যদি শতছিন্ন হয়ে যায় তবু মালিন্য লাগতে দেব না তোমার সংযমে। আমি ডাকব না তোমাকে, শুধু প্রতীক্ষা করব।

তারপর ফিরে আসে গুহাভ্যন্তরে। কটিবন্ধের তরবারিটি খুলে ফেলে। উন্মুক্ত করে বক্ষাবরণ লৌহজালিক। শয়নের পূর্বে সে সচরাচর উন্মুক্ত করে দেয় রেশমের কঞ্চুকগ্রন্থী; কিন্তু আজ করল না। মৃগচর্মটি অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে এনে শয়ন করে প্রস্তর-শয্যায়।...

এ সকল কথাই অক্ষুমতী অকপটে বর্ণনা করেছিল তার প্রিয়সখী শ্রবণার নিকট, কুচী নগরীতে পুনর্মিলনের পরে। সব, সব কথা। শুধু তাই নয়—সে-

রাত্রে যে অদ্ভুত অবৈধ স্বপ্নটা দেখেছিল, সবিস্তারে সে-কথাও বর্ণনা করেছিল। স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্ন অবৈধ, অশালীন হলে স্বপ্নদ্রষ্টার অপরাধ কোথায়? গ্রহাচার্যকে প্রশ্ন করলে তিনি হয়তো এ স্বপ্নমঙ্গলের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। কিন্তু তা কি সম্ভব? এ স্বপ্নমঙ্গলের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। কিন্তু তা কি সম্ভব? এ স্বপ্ন যে নিতান্ত অশ্লীল। বস্তুত স্বপ্নকাহিনীর একটি পর্যায় সে তার প্রিয় সখীকেও ব্যক্ত করতে পারেনি। তার কার্যকারণ সম্পর্ক সে যে নিজেই অনুধাবন করতে পারেনি। স্বপ্ন কি এভাবে বাস্তব প্রমাণ রেখে যেতে পারে?

অক্ষুমতী সে-রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিল—গভীর রাত্রে কে যেন তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর নির্মম বাহুবন্ধের নিষ্পেষণে ওর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। স্বপ্ন যদিচ, তবু ওর পূর্ণ জ্ঞান ছিল। প্রথমটায় তার বিশ্বাসই হয়নি—যার দৃঢ় আলিঙ্গনে সে আশ্লেষশয়নে আবদ্ধ, তিনি—তিনিই! কিন্তু পরমুহূর্তেই কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর চন্দ্রালোকে সে সন্দেহাতীতরূপে সনাক্ত করে ফেলে তাঁকে—সেই ঘননীল চক্ষুদ্বয়, উন্নত নাসা, মুণ্ডিতমস্তক, তপ্তকাঞ্চন বর্ণ। সেই তিনি—যিনি নিজমুখে স্বীকার করেছিলেন, তিনি শুধু ভিক্ষু নন, তিনি মানুষ।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। তবু কী একটা কথা বলতে যায় অক্ষুমতী। পারে না। কারণ পরমুহূর্তেই—কী লজ্জা! কী অপরিসীম লজ্জা! তিনি ওর মুখচুম্বন করলেন। সে যেন অনন্তকাল···বক্ষপঞ্জর যেন বিদীর্ণ হতে চায়···বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। উঠে বসতে গেল। পারল না। পরমুহূর্তেই যে ঘটনাটা ঘটল তা অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! কল্পনাতীত! তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ নির্মমহস্তে উন্মোচন করে দিলেন ওর বক্ষবন্ধনী! গ্রন্থিমুক্ত হল অনুরাগরক্তিম রেশম কঞ্চুলিকা! তখনও পূর্ণ জ্ঞান আছে অক্ষুমতীর। নির্বাপিতপ্রায় অগ্নিকুণ্ডের ঈষদালোকে সে স্পষ্ট দেখতে পেল—ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছেন তার নিরাবরণ চন্দনকুঙ্কুমচর্চিত বক্ষের দিকে। থর থর করে কেঁপে উঠল রত্যাতুরা অক্ষুমতী! সে আনন্দশিহরণে ভূকম্পনস্পন্দিত যুগল ভূধরের ন্যায় বেপথুমান হল ওর তনুতে অতনুর যুগ্মজয়স্তূপ! সেই মুহূর্তেই জ্ঞান হারালো রাজনন্দিনী।

নিঃসন্দেহে এ এক অবৈধ, অশালীন, অশ্লীল স্বপ্ন। জিতেন্দ্রিয় ভিক্ষু বুদ্ধযশস্-এর পক্ষে নিদ্রাভিভূতা অসহায়া এক অনাঘ্রাতা ষোড়শীকে আক্রমণ করা অসম্ভব! তদুপরি তার মুখচুম্বন করা, তাকে বিবস্ত্রা করা দুঃস্বপ্নেরও অগোচর! কিন্তু স্বপ্ন যদি দুঃস্বপ্ন না হয়! পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে অক্ষুমতী দেখেছিল—সে যথারীতি মৃগচর্মাসনে একাকী শায়িতা। গুহাদ্বারের কপাট উন্মুক্ত নয়

এবং ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ বাহিরে পাষাণচত্বরে গভীর নিদ্রামগ্ন। সুতরাং দুঃস্বপ্নই হোক আর বঞ্চিতা নারীর সুখস্বপ্নই হোক, এ শুধু স্বপ্নই—মায়া, মতিভ্রম, উপেক্ষিতা পূর্ণযৌবনা রমণীর অন্তর-কামনার এক তির্যক পরিতৃপ্তি। ওর জাগরমন যে চিন্তাটিকে অস্বীকার করতে চায়, অবচেতনের বিদ্রোহে স্বপ্নরাজ্যে এ বোধ করি তার এক বঙ্কিম পরিতুষ্টি। শুধু অক্ষমতী নয়, প্রিয়সখীর কাছে স্বপ্নমঙ্গলকথা আদ্যন্ত শ্রবণ করে শ্রবণাও সেই সিদ্ধান্তে এসেছিল।

কিন্তু!

যে-কথা 'পিয়সহির'-র নিকটেও স্বীকার করতে পারেনি অক্ষমতী, তার কী অর্থ? কী তার ব্যাখ্যা? সে যে এক পরম বিস্ময়। চরম রহস্যঘন। স্বপ্ন কখনও এমন বাস্তব প্রমাণের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়?

পরদিন নিদ্রাভঙ্গে অক্ষমতী দেখেছিল—তার উন্মোচিতগ্রন্থি রেশমবস্ত্রের বক্ষাবরণ কঞ্চুকটি নিদারুণ লজ্জায় ওর চরণপ্রান্তে লুন্ঠিতা।

ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত!
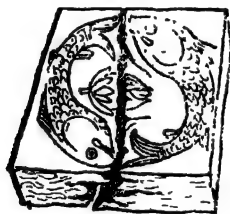
মদনোৎসবের প্রমত্ত কলকোলাহলকে পিছনে রেখে অপরাহ্ণবেলায় একজন তরুণবয়স্ক অশ্বারোহী আস্কন্দিত গতিচ্ছন্দে নির্জন পার্বত্যপথে অশ্বারোহণে চলেছিলেন উত্তরাভিমুখে। অশ্বারোহীর অঙ্গে যোদ্ধৃবেশ, বক্ষে লৌহজালিক, পৃষ্ঠে তূণীর, বামস্কন্ধে রণশার্ঙ্গ, মস্তকে উষ্ণীষ—কিন্তু মুখাবয়বের উপর একটি মুখোস। পথচারীরা এজন্য আদৌ বিস্মিত নয়; কারণ আজ মদনোৎসব—বাসন্তী পূর্ণিমা। এ উৎসবে কী পুরুষ কী নারী সকলেই উষ্ট্রচর্ম-নির্মিত মুখোসে একদিনের জন্য আত্মগোপন করে। সূর্যোদয়ে উৎসবের আরম্ভ, সূর্যাস্তে সমাপ্তি। সমস্ত দিনমান কুমকুমে-ফাগে, আবীরে-গুলালে পরস্পরকে ওরা রাঙায়; কিন্তু পরস্পরের পরিচয় পায় না। এ রীতি বোধ করি রোমক সভ্যতার নিকট থেকে মধ্য এশিয়ার পথে এই পার্বত্য জনপদে সমাগত। মদনোৎসবের রতিরঙ্গে উচ্চনীচ ভেদ নাই—অনূঢ়া, বিবাহিতা এবং বিধবাদিগের এ উৎসবে যোগদানে সমান অধিকার—প্রাপ্তযৌবনই এ রাজ্যে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র। অনুরূপ-

ভাবে পুরুষদিগেরও ঐ একই ছাড়পত্র—কুমার, বিবাহিত অথবা মৃতপত্নী। পরস্পরের পরিচয়দান যদিও শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ, তবু দুর্জনে বলে—গোপন প্রেমিক-প্রেমিকা এই একটি দিবসে অবৈধ প্রেমের আসরে পরস্পরকে পূর্বেই বেশ-বাসের সঙ্কেত জানায়, কোথায় কোন দণ্ডে প্রতীক্ষায় থাকবে তা জ্ঞাপন করে। রাজাবরোধের বিবাহিত বহু সম্ভ্রান্ত পুরললনাও তাদের প্রাক্‌বিবাহ জীবনের প্রেমাস্পদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে—একটি দিন অতীত স্মৃতির রোমন্থনে অতি-বাহিত করে। সমাজ ওদের অবদমিত কামের ক্ষণিক তৃপ্তি স্বীকার করে নেয়। দিবাবসানে যে যার চিহ্নিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। আশ্চর্য, অদ্ভুত উৎসব!

পাকদণ্ডী পথে আমরা যে তরুণ অশ্বারোহীকে দেখছি, মুখোসের জন্য তাঁকে সনাক্ত করা যায় না বটে, তবে জনান্তিকে পাঠককে জানিয়ে রাখতে পারি, তিনি এ কাহিনীর নায়িকা—ছদ্মবেশী রাজনন্দিনী অক্ষমতী। মদনমন্দির প্রাঙ্গণের নৃত্যগীত উৎসবে মন্দভাগিনী তৃপ্ত হতে পারেননি। অনুষ্ঠানে নানান দেশের সুপুরুষ তরুণ সমাগত—কুঞ্জে কুঞ্জে বিতানে বিতানে যুগল প্রেমিক-প্রেমিকা; মদন-মন্দির কুট্টিমে নৃত্যগীতের নিরবচ্ছিন্ন আসর। মদিরার স্রোতে মন্দির-সোপান পিচ্ছিল। বাতাসে ভাসমান অনুরাগরক্তিম আবীর। কিন্তু এ আনন্দ উৎসবে অক্ষমতী অন্তর থেকে যোগ দিতে পারেননি। তাঁর গুপ্তচর গোপনে সংবাদ এনেছে—'তিনি' এ উৎসবে আদৌ আসেননি!

রাজপুত্রী ইচ্ছা করেই পুরুষের ছদ্মবেশে মদনোৎসবে এসেছিলেন—যাতে অপরিচিত কোনও রসলোভী ভ্রমর আকৃষ্ট না হয়। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বেশ অনুভব করেন—প্রতিযোগী রাজপুত্রেরা রাজনন্দিনীর সন্ধানে সারা দিনমান কী ভাবে তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল।

অপরাহ্ণবেলায় শ্রবণার কর্ণমূলে তিনি নিবেদন করলেন—গোপনে তিনি মদনোৎসব প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে যাচ্ছেন।

শ্রবণা অস্ফুটে প্রশ্ন করে, কোথায় যাবে প্রিয়সহি? তিনি কোথায় জেনেছ?

: জেনেছি। মহা-থের-এর সঙ্গে তিনি অতি প্রত্যুষে অশ্বারোহণে থ্যিজিল সঙ্ঘারামে যাত্রা করেছেন।

: থ্যিজিল সঙ্ঘারাম! মহাস্থবিরের সঙ্গে? সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ পেলেই বা কি বলবে?

: কিছু বলব না। শুধু তাঁর পদপ্রান্তে একমুঠো আবীর নামিয়ে দেব।

: যদি তিনি প্রশ্ন করেন—এর অর্থ কী?

: বলব—তিনি ভিক্ষু হলেও : মানুষ !

খ্যিজিল সঙ্ঘারাম কুচী নগরীর এক যোজন উত্তরে। বর্তমান শতাব্দীতে অধ্যাপক স্টাইন যে খ্যিজিল সঙ্ঘারাম আবিষ্কার করেছেন সেটি তখনও অজাত। সেই অপূর্ব পার্বত্যগুম্ফার ভাস্কর্য-স্থাপত্য এবং অজান্তা শৈলীর অনুকরণে বিচিত্র প্রাচীরচিত্র তখনও জন্মলাভ করেনি। সেখানে প্রথম গুহামন্দিরটি কুচীরাজের অর্থানুকূল্যে এবং মহাস্থবির কুমারজীবের শিল্পনির্দেশে সবেমাত্র উৎকীর্ণ করা হয়েছে। একটি মাত্র গুহাচৈত্য, যার স্তূপটি উৎকীর্ণ, বহির্দ্বারের কারুকার্য অসম্পূর্ণ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি—শতাধিক বৌদ্ধ শিল্পী ও ভাস্কর নিরলস পরিশ্রমে সেটি রূপায়িত করছেন। মহাস্থবির সপ্তাহে একদিন সে কার্য পরিদর্শনে যান। যেমন আজ গিয়েছেন ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ সমভিব্যাহারে।

ক্রমে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল মদনোৎসবের কলকোলাহল, কুচী নগরীর হর্ম্য-রাজি। নির্জন গিরিসংকটে কদাচিৎ দু-একটি মেষ-চারক। ওরা এ জনপদের অন্তেবাসী। তারপর সম্পূর্ণ জনহীন পথ—শুধুমাত্র তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গ অন্তরালে রেখেছে দিগন্তকে। খ্যিজিল সঙ্ঘারামের প্রবেশদ্বারে যখন উপনীত হলেন তখন সূর্য পশ্চিম পর্বতশৃঙ্গের পরপারে অবলুপ্ত। দু-একটি তারকা ফুটতে শুরু করেছে আকাশে। বৌদ্ধ ভাস্করের দল সমস্ত দিবসের কায়িক পরিশ্রমে ক্লান্ত, বিশ্রাম নিয়েছেন তাঁরা। তবু একক অশ্বারোহীকে অগ্রসর হতে দেখে গুহাদ্বারে বহির্গত হয়ে আসেন পীতবসনধারী একজন বৃদ্ধ শ্রমণ। মুণ্ডিতমস্তক, শীর্ণ কলেবর, মুখা-বয়বে প্রশান্ত বৈরাগ্যের আলিম্পন। অক্ষমতী অশ্ব হতে অবতরণ করে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে তাঁকে প্রণতি জানায়। বৃদ্ধ দুই হাত উত্তোলন করে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন।

: আর্য, আমি কুচী নগরী থেকে আসছি, মহাস্থবির কুমারজীব এবং তাঁর সঙ্গী ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ এখানে এসেছেন শুনলাম…

: তাঁরা উভয়েই এখানে উপস্থিত। অদ্য রাত্রিতে এখানেই তাঁরা থাকবেন। তোমার পরিচয় ?

: মার্জনা করবেন ভদন্ত ! পরিচয় প্রদানে আমি অসমর্থ !

বৃদ্ধের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। একটু চিন্তা করে বললেন, তোমার মুখ মুখোসে আবৃত। সম্ভবত তুমি কুচী নগরীর মদনোৎসব প্রাঙ্গণ থেকে আসছ। সত্য কি ?

: সত্য ভদন্ত। আমি সেই স্থান থেকেই আসছি বটে।

কিন্তু সে উৎসবে বহু বিজাতীয় রাজপুরুষ যোগদান করেছেন বলে শুনেছি।

তোমার পরিচয় না জেনে আমি কি-ভাবে—

বৃদ্ধের বাক্যটি সমাপ্ত হয় না। কারণ তৎপূর্বেই অক্ষমতী তার অনামিকা থেকে রাজ-অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি মুক্ত করে বৃদ্ধের চরণপ্রান্তে রাখে। সেটি পরীক্ষা করে বৃদ্ধ বললেন, তুমি ভিতরে যেতে পার আয়ুষ্মন।—অঙ্গুরীয়টি তিনি প্রত্যর্পণ করেন।

অশ্বটিকে উন্মুক্তস্থানে রেখে অক্ষমতী সোপানাবলী অতিক্রম করে অলিন্দের উপর উপনীত হয়। গুহাভ্যন্তর ঈষাদলোকিত। স্তম্ভের ও-প্রান্তে পিত্তলের দীপদণ্ডে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছে। তারই অনুজ্জ্বল আলোকে গুহার অভ্যন্তরভাগ রহস্যময়। দুইজন বৌদ্ধ শ্রমণকে দেখা যায়—তাঁরা মুখোমুখি বসে আছেন পদ্মাসনে। একজন বৃদ্ধ—ঈষদুচ্চ কাষ্ঠাসনে বসে আছেন—সমং-কায়শিরগ্রীব ভঙ্গিমায়। অক্ষমতী তাঁকে চিনতে পারে—মহাস্থবির কুমারজীব। তাঁর সম্মুখে জোড়হস্তে যিনি সারঙ্গচর্মাসনে উপবিষ্ট তিনি ভিক্ষু বুদ্ধযশস্। মহাস্থবিরের সম্মুখে একটি পুঁথি—তিনি তা থেকে কিছু পাঠ করছেন। অক্ষমতী চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে। কক্ষে আর কেহ নাই। অতি সন্তর্পণে সে পাষাণগাত্রের সন্নিকট দিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়। একটি স্তম্ভের অন্তরালে আত্মগোপন দরে। শাস্ত্রালোচনায় মগ্ন দুটি মুমুর্ষুকে সে এ সময় বিরক্ত করতে অনিচ্ছুক। পাঠ সমাপ্ত হলে সে আত্মঘোষণা করবে। তার বাম হস্তে একটি উষ্ট্রচর্মের থলিকা—আবীরচূর্ণে পূর্ণ।

পাঠ শেষ হল। মহাস্থবিরের দৃষ্টি এবার শ্রোতার মুখের উপর বর্ষিত হল। তিনি বললেন, হে মাননীয় ভিক্ষু বুদ্ধযশস্! আপনার নিকট নিদান হইতে অধিকরণ শপথ পর্যন্ত অধ্যায় পাঠান্তে পারাজিক সঙ্ঘাদিবিশেষ ধর্মের মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলাম। এক্ষণে প্রথানুসারে প্রশ্ন করিতেছি, যদি কোনও পাপ করিয়া থাকেন স্বীকার করুন। আর যদি পাপ না করিয়া থাকেন, সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ থাকেন, তবে মৌন থাকুন।

মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি ভিক্ষু ধীরে ধীরে মুখ তুললেন। অপাপবিদ্ধ শান্ত দুটি চোখের দৃষ্টি মহাস্থবিরের মুখের উপর রেখে যুক্তকরে অচঞ্চলভাবে বললেন, থের! আমি নীরব থাকতে পারছি না। কিন্তু আমি পাপ করেছি কিনা তা-ও জানি না। কী পাপ, কী পুণ্য তা আমার বুদ্ধিতে মূল্যায়ন করতে পারছি না। নিরন্তর আমি প্রার্থনা করছি—হে শাক্যশ্রেষ্ঠ, হে লোকজ্যেষ্ঠ, তুমি আমার ভ্রান্তি অপনোদন কর, আমার অজ্ঞানতমসা বিদূরিত কর, সম্যক দৃষ্টি প্রদান কর—আমাকে বলে দাও, আমি পাপী কিনা! কিন্তু হে ভদন্ত! আমি আজও আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর পাই নাই। আমি জানি না, কোনও পাপ আমাকে স্পর্শ করেছে কিনা!

মহাস্থবির কুমারজীব বিস্মিত, কিন্তু নির্বাক।

ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ পুনরায় বলেন, মহা-থের! আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করি। আপনি বিধান দিন। যদি আমি পাপ করে থাকি, তবে পাতিমোক্ষ-বিধানে আমাকে কঠিনতম শাস্তি দিন!

মহাস্থবির বলেন, আপনি শান্ত হন মাননীয় ভিক্ষু। আমি আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত। যে ঘটনার জন্য আপনি অনুতাপ বোধ করছেন, তা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করুন। শ্রবণান্তে আমি বিধান দেব। আমি অতঃপর কর্ণময়।

আশ্বস্ত হলেন বুদ্ধযশস্। যে দুর্বহভার একদিন একাকী বহন করছিলেন আজ তা গুরুর পদপ্রান্তে নামিয়ে দেবার অনুমতি পেয়েছেন। আর তাঁর দায় নেই। এখন মহাস্থবির যা বিধান দেন তিনি নতমস্তকে স্বীকার করে নেবেন।

একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করতে থাকেন উদাসীন নির্লিপ্ততায়। সে কাহিনীর শুরু কুমারজীবের কাশগড় আগমনে। সেই যেখানে তিনি রাজনন্দিনী অক্ষমতীকে প্রথম দেখেন। নিজ চিত্তচাঞ্চল্যের কথা অকপটে স্বীকার করলেন বুদ্ধযশস্। স্বীকার করলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যারতির সময় তাঁর মন কী-ভাবে প্রতীক্ষায় উন্মনা হয়ে যেত। বর্ণনা করলেন সেই তুষারঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত সন্ধ্যাটির কথা —কী-ভাবে তিনি সূচীশিল্পচিত্রিত উত্তরীয়টি প্রত্যাখ্যান করে বিড়ম্বিত হন—তবু তুষারপাত অস্বীকার করে অতিথিকে চৈত্যগৃহ থেকে পথে বিতাড়িত করেন। তারপর শৈলদেশ থেকে কুচী নগরীতে প্রত্যাবর্তনের বিস্তারিত দিনপঞ্জিকা। আশ্চর্য! প্রতিদিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে স্মৃতিপটে। অক্ষমতীর নিকটে সেই উত্তরীয়টি পুনরায় ভিক্ষা করা…অক্ষমতীর প্রত্যাখ্যান। রাজকন্যা তাঁকে অনুরোধ করেন নাম ধরে ডাকতে…ভিক্ষু বুদ্ধযশস্-এর প্রত্যাখ্যান! কিন্তু সেখানেই শেষ নয়—বর্ণনা করলেন নিদারুণ ভূমিকম্পে অক্ষমতী যখন অতলস্পর্শী খাদে পতিত হতে যাচ্ছিল, তখন কী-ভাবে তিনি তাকে দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করেন। শুধু তাই নয়, ভিক্ষু অকপটে স্বীকার করলেন—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই খণ্ডমুহূর্তে রাজকুমারীকে বাহুবন্ধের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ করে আমি…হ্যাঁ স্বীকার করছি…এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ লাভ করছিলাম। জানি না, সে আনন্দ একটি নারীকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করায়, অথবা তাতে গিরিমেখলবাহনের কোন কৌতুক মিশ্রিত ছিল কিনা।

সেই ঘটনার পর থেকে আমার প্রতিনিয়ত মনে হচ্ছে—

অনিকৃকসাবো কাসাবং যে বথং পরিদহেস্সতি।
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি॥[২]

পাষাণচত্বরে ঝরে পড়ল মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি ভিক্ষুর দুই ফোঁটা অশ্রু। তিনি নীরব হলেন।

মহাস্থবির বলেন, আপনি বলে যান মাননীয় ভিক্ষু। আমি কর্ণময়'

বুদ্ধযশস্ এরপর বর্ণনা করেন, দিবাবসানে তাঁদের পার্বত্যগুহায় আশ্রয় নেবার কথা। অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর সঞ্চিত চণক ও চিপিটক অপহরণ করে কৌতুকময়ীর সঙ্গে তাঁর কী জাতের রসালাপ হয়েছিল সে কথাও বললেন। বর্ণনা করলেন, রাত্রি-যাপনের পূর্বে তাঁদের কী ধরণের কথোপকথন হয়েছিল। তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের কথা কেন তিনি সেই গুহাভ্যন্তরে রাত্রিযাপনে স্বীকৃত হতে পারলেন না।

—অন্ধকারে লজ্জায় অনুশোচনায় মাটিতে মিশে গেল অক্ষমতী।

: তারপর ?

এরপর তরুণ ভিক্ষু যা বললেন তা আরও অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য। বজ্রাহত হয়ে গেল অক্ষমতী !

: গভীর রাত্রে একটা অস্ফুট গোঙানি শুনে আমার নিদ্রাভঙ্গ হল। প্রথমটা কিছুই স্মরণ হল না। প্রচণ্ড শীতে এবং তুষারপাতে আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। সহসা মনে হল, যন্ত্রণাসূচক শব্দটা গুহাভ্যন্তর থেকে আসছে। রাজকন্যার নিরাপত্তা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি। গুহাকপাট উন্মুক্ত করে ভিতরে পদার্পণ করেই বুঝতে পারি—কী হয়েছে। নীরন্ধ্র গুহাভ্যন্তরে বায়ু গমনাগমনের দ্বিতীয় ছিদ্রপথ নেই,—আমরা তদুপরি সেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত করাতেই এই সর্বনাশ হয়েছে। ভূশয্যালীন রাজকন্যার নিকটস্থ হয়ে আমার নিজেরই শ্বাসকষ্ট শুরু হল। দেখলাম—শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উনি নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছেন। বাতাসের অভাবে অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়েছে, তবু জ্বলন্ত অঙ্গারপিণ্ডে গুহাভ্যন্তর পরিদৃশ্যমান—কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রোদয়ও হয়েছিল। রোগিণীর নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলাম, গতি অতি ক্ষীণ। একমুষ্টি বিশুদ্ধ বাতাস ! নাহলে ঐ মুমূর্ষু রোগিণীর অচিরে জীবননাশ অবধারিত। তাঁকে গুহার বাইরে আনা যায়, কিন্তু গুহাভ্যন্তর অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং বাইরে তখন তুষারপাত শুরু হয়েছে। অমন একটি মুমূর্ষু রোগিণীকে সে অবস্থায় এ-জাতীয় উত্তাপের পরিবর্তনে নিয়ে আসাও বিপদজনক। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অপেক্ষা করলাম। তারপর সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূরে ফেলে—

ভিক্ষু নীরব হলেন। মহাস্থবির যেন প্রস্তরমূর্তি। অন্তরালে অক্ষমতীও কাষ্ঠপুত্তলী।

: অকপটে সব কথা স্বীকার করতে আমি বদ্ধপরিকর। মহা-থের ! আমি

সেই মৃত্যুপথযাত্রিণীর অধরোষ্ঠ উন্মুক্ত করে নিজমুখ সেস্থলে স্থাপন করলাম! ফুৎকারে তাঁর মুখমধ্যে প্রাণবায়ু সিঞ্চন করলাম। ভূকম্পনস্পদিত মেদিনীর মত রোগিণীর সর্বাবয়ব বেপথুমান হল। লক্ষ্য করে দেখলাম—দৃঢ়বদ্ধ কঞ্চুকে তাঁর বক্ষ বিস্ফারিত হতে পারছে না। আমি…আমি পরমুহূর্তেই তাঁর রেশমকঞ্চুকের বন্ধনগ্রন্থি উন্মোচিত করে দিলাম…

দুই হাতে আনন আবৃত করে ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ আর্তনাদ করে ওঠেন।

: তারপর?

: না। তারপর আর তাঁকে স্পর্শ করিনি। কিন্তু সে উত্তপ্ত গুহাভ্যন্তর পরিত্যাগ করে বাইরেও আসিনি। রোগিণীর শিয়রে যাবৎপ্রভাত অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর তাঁর জীবনের আশংকা নাই, তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়েছে অনুধাবন করে আমি বাইরে আসি এবং নিদ্রাভিভূত হই।

পুনরায় নীরব হলেন ভিক্ষু। মহাস্থবির তখনও নিরুত্তর। স্তম্ভের অন্তরালে অমক্ষুতী শুধু চোখের জলে ভাসছে। অর্থী ভিক্ষুই নীরবতা ভঙ্গ করে বলেন, হে জ্ঞানবৃদ্ধ মহা-থের, এক্ষণে বলুন, আমি কি পাপী? পাতিমোক্ষমতে আমি কী দণ্ডগ্রহণ করে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব?

ধ্যানভঙ্গ হল মহাস্থবিরের। বললেন, মাননীয় ভিক্ষু! আপনাকে কোন পাপ স্পর্শ করে নাই। একটি মৃত্যুপথযাত্রিণীকে প্রাণদানের নিমিত্ত আপনি যা কিছু করেছেন তার প্রেরণা করুণার উৎসমুখে। এতে কোন অন্যায় নাই, পাপ নাই।

দুই হস্তে মুখ আবৃত করে আর্তকণ্ঠে ভিক্ষু বলেন, কিন্তু…কিন্তু…

: বলুন?

এবার দীপালোকে অত্যন্ত করুণ দেখালো তাঁকে। তবু মহা-থেরের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে দৃক্‌পাত করে বুদ্ধযশস্ বললেন, আমি যে স্থিরনিশ্চয় হতে পারছি না মহা-থের—কিসের প্রেরণায় আমি যাবৎ প্রভাত সেই গুহাভ্যন্তরে অপেক্ষা করলাম! সে কি গুহামুখের তুষারপাতের বিকর্ষণে কিম্বা উষ্ণ অগ্নিকুণ্ডের আকর্ষণে! অথবা…?

: না। আপনি ব্রাত্য নন! আপনি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এক্ষণে মনস্থির করে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। আপনি আপনার জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছেন ভিক্ষু বুদ্ধযশস্! বলুন—কী আপনার অভিলাষ? কুচীরাজদুহিতাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণান্তে গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ করতে চান? ভবিষ্যৎ কুচীজনপদ-অধিনায়ক হতে ইচ্ছুক? অথবা আমার নিকট উপসম্পদা গ্রহণে অভিলাষী?

: উপসম্পদা! আপনি কি এই অবস্থায় সে দুর্লভ সম্পদ আমাকে প্রদানে স্বীকৃত!

: হ্যাঁ, মাননীয় ভিক্ষু। এক্ষণে আপনি সে অধিকার অর্জন করেছেন।

: তবে সেই মহাসম্পদই আমাকে দান করে আমার জন্ম সার্থক করুন, প্রভু!

: তথাস্তু!

সাষ্টাঙ্গে মহাস্থবিরকে প্রণাম করলেন ভিক্ষু বুদ্ধযশস।

নিমীলিত নেত্রে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন কুমারজীব:

বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে
সয়নে আসনে ঠানে গমনে চাপি সর্বদা।৩

ওঁরা জানতেও পারলেন না—নীরবে একটি ছায়ামূর্তি বহিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সেই খিয়্জিল সঙ্ঘারামের অর্ধসমাপ্ত চৈত্যগুহার গর্ভ থেকে। যেন এক স্বপ্ন-ছায়ামূর্তি। সুখস্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন? জানি না। শুধু স্বপ্নের এক বাস্তব প্রমাণের মত স্তম্ভমূলে পড়ে রইল অনাদৃত একটি থলিকা। কেহই লক্ষ্য করল না,—সে থলিকার গ্রন্থি উন্মোচন করলে দেখা যেত তার অন্ধকোটরে লজ্জায় লাল হয়ে মুখ লুকিয়েছে একমুষ্টি অনুরাগরক্তিম কুমকুমচূর্ণ।
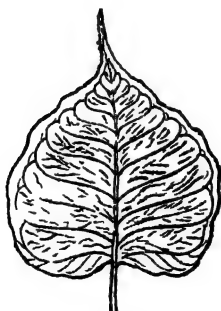
সংবাদ শ্রবণে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কুচীরাজ পো-সাঙ!

অতি প্রত্যুষেই সন্নিধাতা তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করে এ দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করেছে। উৎসবের দিনটির সূত্রপাত রয়েছে ঐ দুঃসংবাদে। কুচীরাজ প্রাতঃকৃত্যাদির সময়ও পাননি। তৎক্ষণাৎ আহ্বান করেছিলেন রাজাবরোধের কঞ্চুকীকে, রাজান্তঃপুরিকার রক্ষক বৃদ্ধ কঞ্চুকী নতমস্তকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, স্বীকার করেছেন ঘটনার সত্যতা—গতকল্য রাত্রিতে কুমারভট্টারিকা অক্ষমতী যোদ্ধবেশে একাকী অশ্বারোহণে প্রাসাদ-কুড্যের বাইরে গিয়েছিলেন্। রাজনন্দিনী এভাবে ইতিপূর্বে বহুবার গভীর

রাত্রে ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে গিয়েছেন—তিনি ক্ষাত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিতা, আত্মরক্ষায় সমর্থা; তদ্ভিন্ন আরক্ষা-অধিকারিকের সুব্যবস্থায় জনপদ পরিসীমার ভিতর তস্করাদির উপদ্রবও নাই। তাই রাজকন্যার এই চপলতায় এতাবৎকাল কঞ্চুকী-মহাশয় আপত্তিও করেননি। কিন্তু গতকাল রাত্রিতে প্রাসাদ ত্যাগের পর রাজকন্যা আর প্রত্যাগমন করেননি।

পো-সাঙ অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আজই কুমারভট্টারিকার স্বয়ম্বর সভার দিন ধার্য হয়েছে। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভার অনবদ্য শ্লোকগুলি তখনও রচিত হয়নি। উজ্জয়িনীর কালিদাস আমাদের কাহিনীর কালে নাবালক মাত্র। কুচী নগরী কিছু পাটলীপুত্র, উজ্জয়িনী, বিদিশা, অবন্তী নয়—অত্যন্ত ক্ষুদ্র জনপদ। স্বয়ম্বর সভায় সহস্রাধিক অভ্যাগতের উপস্থিতির সম্ভাবনা। কাষ্ঠনির্মিত প্রাসাদভবনে অত মানুষের সমবেত হওয়ার মত মিলনকক্ষ নাই। তাই রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভার সাময়িক ব্যবস্থা হয়েছে। একটি দেবদারু কাষ্ঠনির্মিত উচ্চবেদী, তার উপর উষ্ট্রচর্মের চন্দ্রাতপ। দুই পার্শ্বে সুচিত্রিত মঙ্গলকলস এবং চন্দ্রাতপের চতুর্দিকে পতাকা-শোভিত দণ্ড। মঞ্চের সম্মুখভাগে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রার্থী ও সম্ভ্রান্ত দর্শকদিগের কাষ্ঠাসন। পশ্চাদ্‌ভাগে পর্বতগাত্রে কৃত্রিম সোপানশ্রেণী উৎকীর্ণ—সাধারণ প্রজাদিগের আসন। আয়োজন সম্পূর্ণ। দুইদণ্ড বেলা হলেই স্বয়ম্বর সভায় যোগদানেচ্ছু রাজন্যবর্গ ও কুমারগণ উপস্থিত হবেন। তাঁদের যথারীতি অভ্যর্থনার আয়োজনও সুসম্পন্ন। সন্নিহিত রাজপ্রহরীগণ শূলহস্তে পাহারা দিচ্ছে, কিঙ্কর-কিঙ্করীগণ শেষ মুহূর্তের ব্যবস্থাদি করছে। অথচ যাঁকে কেন্দ্র করে এই বিরাট আয়োজন তিনিই গতরাত্রি থেকে নিরুদ্দিষ্টা।

পো-সাঙ বৃদ্ধ কঞ্চুকীকে মৃদু ভর্ৎসনা করে আদেশ করলেন—নগর-কোট্টাল ও নগর-শান্তি-রক্ষককে অবিলম্বে সংবাদ দিতে। তাঁরা যেন বিনা কালহরণে রাজ-সমীপে আসেন। বললেন, এ দুঃসংবাদ যেন সম্পূর্ণ গোপন থাকে। আরও বললেন, রাজান্তঃপুর থেকে অমাত্য শিবমিশ্রের কন্যা শ্রবণাকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করতে। শ্রবণা অনতিবিলম্বেই এসে উপস্থিত হল। কুচীরাজকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়ে নতনেত্রে বদ্ধাঞ্জলিভাবে দণ্ডায়মান থাকে।

: কুমারভট্টারিকা গতকাল রাত্রে কোথায় গিয়েছেন জান? তোমাকে কিছু বলে গেছেন?

শ্রবণার দুই চক্ষু রক্তাভ। শিরশ্চালনে সে নেতিবাচক প্রত্যুত্তর করে।

কিয়ৎকাল ইতস্তত করে রাজা বলেন, তুমি তার প্রিয়তমা বয়স্যা। তুমি জান,

আজ স্বয়ম্বর-সভায় কার বরমাল্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল ?

শ্রবণা প্রস্তরমূর্তির ন্যায় স্থাণু। এ কথার কী প্রত্যুত্তর করবে সে ?

পো-স্যাঙ বলেন, শ্রবণা ! সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় আমি এ অশোভন প্রশ্ন করতাম না। কিন্তু রাজকন্যা শুধু আমার আত্মজা নয়— সে এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ-নৃপতির রাজমহিষী। অন্তত রাজ্যের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে তুমি অসঙ্কোচে তোমার বক্তব্য জানাতে পার।

শ্রবণা বললে, মহাভাগ, এ সংবাদ সম্বন্ধে আপনার অবহিত হওয়ার সময় হয়েছে বলে আমিও বিশ্বাস করি। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি জানি সেই ভাগ্যবানের নাম, যাঁর কণ্ঠে বরমাল্য দিতে পারলে আজ রাজকন্যা কৃতকৃতার্থ হতেন। কিন্তু মহারাজ ! তা হবার নয়—আজকের স্বয়ম্বর সভায় সেই যুবাপুরুষ উপস্থিত থাকবেন না। তিনি প্রিয়সখিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কুচীরাজ। এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ-মহিষী, সর্ববিদ্যাপারঙ্গমা অনিন্দ্যকান্তি অক্ষুমতী প্রত্যাখ্যাতা। স্বয়ং শচীপতি আখণ্ডল যাঁর বরমাল্য পেলে ধন্য হয়ে যান তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে কে ? গম্ভীরস্বরে বলেন, কে সেই যুবাপুরুষ ? রাজনন্দিনীকে প্রত্যাখ্যান করার হেতু কি ?

: তিনি কাশ্মীরী ভিক্ষু বুদ্ধযশস্। গতকাল যিনি মহা-থেরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করে আমৃত্যু ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নিয়েছেন।

ধীরে ধীরে বসে পড়লেন হতভাগ্য মহারাজ। বললেন, তা হলে তো অক্ষুমতীর এ গৃহত্যাগ কোন গোপন অভিসার নয় ! সে কোথায় গিয়েছে অনুমান করতে পার ?

আর্দ্র দুটি কজ্জললাঞ্ছিত নয়ন মেলে শ্রবণা প্রত্যুত্তর দিতে গেল। পারল না। উচ্ছ্বসিত রোদনে তার কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে যায়। তবু তার অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা প্রণিধান করলেন কুচীরাজ। দুই হাত সম্প্রসারিত করে বললেন—ক্ষান্ত হও শ্রবণা ! না না—ও কথা বল না ! সে কেন আত্মঘাতিনী হতে যাবে ?

তবু কথাটা সূচীমুখ-কণ্টকের মত বিদ্ধ হল রাজবক্ষে। অক্ষুমতী আদরের দুলালী। প্রার্থনার পূর্বেই তার বাসনার পূরণ হয়—এতেই সে আবাল্য অভ্যস্তা। সপ্তদশবর্ষের জীবনে ভাগ্যদেবতা তাকে ক্রমাগত অকুণ্ঠ প্রসাদ বিতরণ করছেন— রাজকুলে জন্ম, যৌবরাজ্যে অধিকার, জনপদকল্যাণীর মত রূপ, প্রজ্ঞা-পারমিতার মত বিদ্যা, শক্র-মহিষী পৌলমীর মত ভাগ্য। শুধু একটি দ্রব্যের স্বাদ সে পায় নাই—বঞ্চনা ! আজ প্রথম আঘাতেই কি সে একেবারে ভেঙে পড়েছে ! কুচীরাজ গোপনে নিয়োগ করলেন গুপ্তচর। অশ্বারোহণে একরাত্রে সে কতদূর

যেতে পারে ? যদি জীবিতা থাকে তবে সন্ধ্যাকালের মধ্যেই আরক্ষা-অধিকারিক তাকে উদ্ধার করে আনবে। আর যদি সেই প্রত্যাখ্যাতা রাজনন্দিনী গভীর রাত্রে কোনও পর্বতচূড়ায় আরোহণ করে অতলস্পর্শী সমতলভূমে—?

সূর্য মধ্যগগনে উপনীত। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। একে একে সমবেত হয়েছেন দূর-দেশাগত প্রার্থীগণ। শৈলদেশের কুমার ভট্টারক ধম্মপুত্ত, চক্কুকরাজের দুই পুত্র সূর্যসোম ও সূর্যভদ্র, অগ্নিদেশ, পুরুষপুর, মীরান, তুরফান, নিয়ার রাজন্যবর্গ ও রাজকুমার—বিভিন্ন জনপদের শ্রেষ্ঠীতনয়। সন্নিধাতা বারম্বার তাগাদা দিচ্ছেন—আর বিলম্ব করা অনুচিত। অবিলম্বে রাজকন্যাকে সভায় উপস্থিত করার প্রয়োজন। সভাস্থ সকলে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

এই সময়ে সংবাদ এল মহাস্থবির কুমারজীব মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী। শ্রবণমাত্র মহারাজ চঞ্চল হয়ে ওঠেন—কী আশ্চর্য! মহা-থের-এর কথা এতক্ষণ কী করে বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি? এমন বিপদে তাঁকেই তো সর্বাগ্রে সংবাদ পাঠানো উচিত ছিল। তিনি কুচীরাজের ভাগিনেয়, রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়। অনতিবিলম্বেই রাজসকাশে উপনীত হলেন মহাস্থবির। মহারাজ আসন ত্যাগ করে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রদ্ধানিবেদন করলেন। কুমারজীব স্বস্তিবাচন করে উপবেশন করলে রাজা বসলেন একটি নিম্নাসনে। বললেন, মহা-থের, আপনি স্বয়ং সাক্ষাৎ করতে আসায় আমি ধন্য। বস্তুত আমি আপনাকে সংবাদ প্রেরণ করতে যাচ্ছিলাম। অদ্য প্রাতে আমি একটি মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছি।

কুমারজীব বললেন, রাজন্, আপনি যে বার্তা জ্ঞাপন করতে উদ্যত তা আমার অজ্ঞাত নহে। বস্তুত আমিও ঐ একই উদ্দেশ্যে এখানে সমাগত। চিন্তার কোন কারণ নাই—কল্যাণময়ী অক্ষুমতীর সংবাদ মঙ্গল।

: সে জীবিতা! তার সংবাদ আপনি জানেন?

: রাজকুমারী জীবিতা। সে আমার সঙ্ঘারামে আছে। বস্তুত তাকে একটি পল্যঙ্কিকায় এখানে আনয়নের ব্যবস্থা করেই আমি অশ্বারোহণে আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি।

: সে কি অসুস্থা?

: ছিল। বর্তমানে সে রোগমুক্ত। সে সম্পূর্ণ 'আরোগ্য'-লাভ করেছে।

: শাক্যমুনির অসীম করুণা। সে কি তাহলে স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হতে পারবে?

: পারবে, মহারাজ। সেজন্যই তাকে পল্যঙ্কিকায় এখানে আনার ব্যবস্থা করেছি। আপনি প্রার্থীদিগের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজকন্যা স্বয়ম্বর-সভায়

আজ সমুপস্থিত না হলে কুচীরাজের অপমান। কন্যার কর্তব্য যে অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে আপনাকে উদ্ধার করা। সেজন্যই অক্ষুমতী এ স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হতে স্বীকৃতা।

: তাহলে অন্তঃপুরে সংবাদ প্রেরণ করি। অক্ষুমতীকে বধূবেশে সজ্জিত করার আয়োজন···

: কোন প্রয়োজন নেই মহারাজ। প্রিয় ভগ্নীকে স্বয়ম্বর-সভার উপযুক্ত বেশে সজ্জিতা করেই প্রেরণ করা হয়েছে। সে সরাসরি সভামণ্ডপে আসবে। পরন্তু একটি কথা আপনাকে জ্ঞাপন করি। অক্ষুমতী বস্তুত গতকাল শেষরাত্রেই স্বয়ম্বরা হয়েছেন। নূতন কোন প্রার্থীকে ধন্য করা তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত। সভায় তিনি একথাই ঘোষণা করবেন মাত্র।

কুচীরাজ কী প্রত্যুত্তর করবেন স্থির করে উঠতে পারেন না। অবশেষে বলেন, কিন্তু সে-কথা আমি কেমন করে ঘোষণা করব?

: আপনাকে কিছুই করতে হবে না, মহারাজ। স্বয়ম্বর-সভায় কুচীরাজের পক্ষে বক্তব্য রাখবেন তাঁর ভাগিনেয়—কুচী-সঙ্ঘারামের 'থের'। দায়-দায়িত্ব সমস্তই আমার।

নিশ্চিন্ত হলেন মহারাজ পো-সাঙ।

অতঃপর ওঁরা দুইজন উপস্থিত হলেন সভামণ্ডপে। সভামঞ্চে পাশাপাশি দুটি উচ্চাসন। তার পশ্চাদ্‌ভাগে স্তম্ভের উপর স্ফটিক-প্রস্তরের একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি—ভূমিস্পর্শমুদ্রায় ধ্যানাস্তমিত তথাগত। মূর্তির পশ্চাদ্ভাগে একটি স্বর্ণদণ্ডশীর্ষে ধর্মচক্র ও তদুপরি ত্রি-রত্ন। সভায় কুচীরাজের প্রবেশ-মুহূর্তে রাজপণ্ডিত স্বস্তিবাচন করলেন। সমবেতভাবে তূর্যধ্বনি হল। অতঃপর উষ্ট্রচর্মপটাহাননাদে সভারম্ভ ঘোষিত হল। মহারাজ আসন গ্রহণ করেন। মহাস্থবির কুমারজীব মঞ্চের সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকেন, সুস্বাগতম্! পরম ভট্টারক শ্রীমন্ মহারাজ কুচী-অধিপতির অনুজ্ঞানুসারে আমি, তাঁর হয়ে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা বহুদূর জনপদ থেকে অসীম শ্রমস্বীকার করে কুচীরাজ্যের বাৎসরিক আনন্দ-উৎসবে যোগদান করে আমাদের কৃত-কৃতার্থ করেছেন। আজিকার এ-সভার আয়োজন কেন সে বিষয়ে আপনারা সবিশেষ অবগত। কুচী-জনপদ-অধিপতি পরম ভট্টারক পো-সাঙ ঘোষণা করেছিলেন—আর্যাবর্তের প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা চিরায়ুষ্মতী কল্যাণী অক্ষুমতীকে এ সভায় স্বয়ম্বরা হওয়ার জন্য উপস্থাপিত করবেন। কুমারভট্টারিকা অক্ষুমতী সপ্তদশবর্ষীয়া, প্রাপ্তবয়স্কা। বস্তুত আর্যরীতি অনুসারে স্বয়ম্বরা কন্যার নির্বাচন স্বীকার করে

নিতে কুচীরাজ প্রতিশ্রুত! আপনারাও এখানে সেই প্রতিশ্রুতিমতেই প্রতিযোগী-রূপে অবতীর্ণ—অর্থাৎ স্বয়ম্বরা কন্যার নির্বাচন বিনা প্রশ্নে স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনে প্রয়াসী। এইটুকু ভূমিকা করে আমি ঘোষণা করছি—পরমকল্যাণীয়া অক্ষমতী গতকাল রাত্রের শেষযামে তাঁর গোপন মনোগত বাসনা আমাকে জনান্তিকে জ্ঞাপন করেছেন এবং তাঁর চূড়ান্ত নির্বাচন আমি কুচী-সঙ্ঘারামের 'থের'—অনুমোদন করেছি। তিনি যাঁর কণ্ঠে বরমাল্য দান করবার সঙ্কল্প করেছেন, তিনিও এ স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত। সুতরাং ভাটগণের পক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগীর গুণকীর্তন এ-ক্ষেত্রে বাহুল্য হবে। আপনারা অনুমতি করলে রাজনন্দিনীকে আমি সভায় উপস্থিত করি।

সভামণ্ডপে একটি গুঞ্জন ওঠে। এ সংবাদে সকলেই বিচলিত। সম্ভবত প্রতিটি প্রতিযোগী অন্তরে যে ক্ষীণ আশা পোষণ করে সমবেত হয়েছিলেন তা নির্মূল হল—সকলেই অনুমান করেছেন, রাজকুমারী কোন একজন ভাগ্যবানের সঙ্গে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন। শুধু অনুধাবন করা গেল না—সে-ক্ষেত্রে রাজকন্যা কেন প্রকাশ্য সভাতেই তার কণ্ঠে বরমাল্য দুলিয়ে দিলেন না, কেন মহাস্থবিরকে স্বয়ম্বর সভার পূর্বরাত্রে গোপনে সেই প্রেমিকের নাম জ্ঞাপন করলেন! সভাস্থ সকলের মুখপাত্রস্বরূপ শৈলদেশের কুমার ভট্টারক ধর্মপুত্র দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, মহা-থের যেমন অনুজ্ঞা করলেন তাই হোক। রাজনন্দিনীকে প্রকাশ্য সভায় আনয়ন করা হোক। তিনি সর্বসমক্ষে সেই ভাগ্যবানের কণ্ঠে বরমাল্য দিলেই আমরা আনন্দিত হব।

কুমারজীবের ইঙ্গিতে প্রবেশদ্বার দিয়ে আটজন পল্যঙ্কিকা-বাহক সভামণ্ডপে প্রবেশ করল। মঞ্চের পাদদেশে উপনীত হয়ে তারা সেটিকে ভূতলে নামিয়ে রাখে। মহাস্থবির স্বয়ং অগ্রসর হয়ে আসেন। পল্যঙ্কিকার প্রবেশপথের উশীরসদৃশ্য সূক্ষ্ম-জালিকা উন্মোচন করে বলেন, নেমে এস অক্ষমতী! অভ্যাগতগণ তোমাকে দর্শন করতে চান। তোমার নির্বাচন ঘোষণা কর।

ধীরপদে বাহির হয়ে আসে অক্ষমতী। তার দক্ষিণ হস্তে একটি ঘননিবদ্ধ পুষ্পমাল্য। ধীরে ধীরে সোপানাবলী অতিক্রম করে সে মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত হয়। প্রথমে বুদ্ধমূর্তি, পরে রাজা এবং তৎপরে সভাস্থ মাননীয় অতিথিবৃন্দকে যুক্তকরে নতি জানায়।

একটা বিস্ময়মিশ্রিত হাহাকার সভার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ভেসে যায়।

রাজনন্দিনীর বধূবেশ নয়। তাঁর অঙ্গে ত্রি-চীবর; তাঁর আষাঢ়সঘন জলদসম্ভারের মত কুন্তল নিশ্চিহ্ন—মুণ্ডিত-মস্তক তিনি। বরমাল্য ছাড়াও তাঁর

হস্তে যষ্টি ও ভিক্ষাপাত্র। দেববাঞ্ছিতা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সর্বাঙ্গে এক স্বর্গীয় জ্যোতির বিচ্ছুরণ।

রাজকন্যা অক্ষমতী আজ সন্ন্যাসিনী। ভিক্ষুণী। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন, গতকাল নিশীথ রাত্রে।

বিস্ময়-বিমূঢ় জনতার দিকে পিছন ফিরে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে আসেন সিংহাসনের দিকে। মহারাজ দণ্ডায়মান হয়েছেন। তিনি যেন বজ্রাহত' কুমারভট্টারিকা তাঁকে অতিক্রম করে বুদ্ধমূর্তির সমীপস্থ হলেন। প্রণামান্তে তিনি বরমাল্যটি নামিয়ে রাখেন তথাগত বুদ্ধের চরণমূলে।

মহাস্থবির তখন মন্ত্রোচ্চারণ করছেন :

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধিমাগঞ্ছি অনন্তঞাণো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং।

দীর্ঘ দশ বৎসর পরের কথা।

এ দশ বৎসরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। অনুমান করতে পারি, ঘটনা চলেছে ধীর মন্থর গতিতে—রেশম সড়কবাহী সার্থবাহের উষ্ট্রের সারির মত। কুমারজীবের মাতা দীর্ঘদিন পূর্বেই কুচী নগরী ত্যাগ করে গিয়েছেন। শেষ জীবনটুকু তিনি তাঁর স্বামীর দেশে অতিবাহিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাই কুচীরাজের ব্যবস্থাপনায় তিনি কাশ্মীরে গমন করেন। সেখানকার সঙ্ঘারামে কবে কী-ভাবে তাঁর নির্বাণলাভ হল ইতিহাস তা লিখে রাখতে ভুলেছে। ভিক্ষুণী জীবা ছিলেন কুচী নগরীর সর্বপ্রধান সন্ন্যাসিনী-আশ্রম 'আ-লী' বিহারের 'অগ্‌গ-বিনতা'। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে ভিক্ষুণীদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান—'অগ্রসেবিকা'। সে সম্মান, যতদূর জানি, শাস্ত্রমতে মাত্র দুইজন লাভ করেছিলেন—ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণা ও কাশীমহিষী ক্ষেমাদেবী। সুতরাং নূতন কোন ভিক্ষুণীদিগের সঙ্ঘারামে সর্বোচ্চ অধিকারিকার সংজ্ঞা 'অগ্‌গবিনতা,' অথবা অগ্রবিনতা। অর্থাৎ পূজারতির সময়

প্রথম প্রণাম নিবেদনের অধিকারিণী। ভিক্ষুণী জীবার প্রস্থানের পরে আ-লী-বিহারে অগ্রবিনতা হয়েছেন ভিক্ষুণী অক্ষমতী।

বৃদ্ধ পো-সাঙের উত্তরাধিকারী অনির্দিষ্ট। তিনি এখনও কুচীরাজ।

মহাস্থবির কুমারজীবের বয়ঃক্রম একষষ্টি বৎসর। এখনও তিনি জরাগ্রস্ত নন। অর্হৎ বুদ্ধযশস্ শৈলদেশের সঙ্ঘারামে সাধনরত। অক্ষমতীর সন্ন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি কাশগড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। কুচীজনপদের সন্নিকটস্থ খ্যিজিল সঙ্ঘারামে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গুহামন্দির সমাপ্তির পথে।

কালের মাপে আমরা বর্তমানে আছি ৩০৪ শকাব্দে, যাবনিক বিচারে যা নাকি ৩৮২ খ্রীষ্টাব্দ। মধ্য এশিয়ার এই অখ্যাত জনপদে সংবাদ পৌছায়নি কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকায় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকাল সমাপ্ত। মগধাধিপতি রাজচক্রবর্তী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অর্থাৎ সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের আট বৎসর অতিক্রান্ত। ভট্ট কালিদাস নামক এক অখ্যাতনামা উদীয়মান কবির বাচালতায় নাকি উজ্জয়িনীর প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিরক্ত, যদিচ নবীনেরা ক্রমে এই আধুনিক কবির ভক্ত হয়ে উঠছে। আহিওলে শ্রীদুর্গার একটি মন্দির ইতোমধ্যেই ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের এক নূতন যুগের সূচনা করেছে।

এই সময়ে কুচীজনপদের নির্মেঘ আকাশে দেখা দিল কালবৈশাখীর আভাস। ইতিমধ্যে মহাস্থবিরের সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে প্রসারিত হয়েছে। বহু দূরাগত হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ এবং তাও-পন্থী পণ্ডিতগণ মীমাংসার সন্ধানে আসেন কুচী সঙ্ঘারামে। তক্ষশীলা, পুরুষপুর, এমন কি কাশী, মথুরা, ইন্দ্রপ্রস্থ থেকেও পণ্ডিতেরা সমবেত হন ঐ শৈলরাজ্যে—ওদিকে তুরফান, মীরান, তুনহুয়ান অঞ্চলের হীনযানী বৌদ্ধরাও সমাগত হন। বহু চৈনিক বৌদ্ধ পণ্ডিতও আসতেন। তার একটি বিশেষ কারণ ছিল। চীনখণ্ডে এতদিন যে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল তা হীনযানী মত। কুমার-জীব মহাযানী। ফলে স্বতই মীমাংসার প্রয়োজন হত।

এইস্থানে 'হীনযান' ও 'মহাযান' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বোধ করি কিছু ইতিহাস আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ছে :

গৌতমবুদ্ধের মহাপরিনিব্বাণের অব্যবহিত পরে মগধের রাজধানী রাজগৃহে নাকি একটি মহা বৌদ্ধ-সম্মেলন হয়। সঙ্ঘোত্তম কাশ্যপ সে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং গৌতমের প্রত্যক্ষ শিষ্য উপালী সে সভায় 'বিনয় পিটক' আবৃত্তি করে শোনান। গৌতমের প্রিয়তম শিষ্য আনন্দ পাঠ করে 'সুত্ত পিটক'। বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত এ-তথ্য ঐতিহাসিকের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন, কারণ ইতিহাস অনুমান করে বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশ সঙ্কলিত হয়ে পিটকগুলি লিপিবদ্ধ হয় অনেক পরে।

বস্তুতপক্ষে এই শাস্ত্রগুলি ভারত ভূখণ্ড থেকে কালে অবলুপ্ত হয়ে যায়, এবং বৌদ্ধ অর্হতেরা অনেক পরবর্তীকালে সিংহলী ভাষা থেকে পালিতে সেগুলি পুনরায় অনুবাদ করে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনেন।

সে যাই হোক, কথিত আছে বৌদ্ধধর্মের দ্বিতীয় মহা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বৈশালীতে, অর্হৎ রেবতের সভাপতিত্বে। সম্ভবতঃ মহাপরিনিব্বাণের শতবর্ষ পরে। এই সভাতেই দেখা গেল বৌদ্ধধর্ম মতাবলম্বীদের মধ্যে আচার, অনুষ্ঠান ও বিধিনিষেধ বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। সঙ্ঘ অতঃপর দুইটি পৃথক চিন্তা-ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল: প্রাচীনপন্থী স্থবিরবাদী এবং নবীনপন্থী মহাসংঘিকা দল।

তৃতীয় মহাসম্মেলন হয়েছিল মগধের তদানীন্তন রাজধানী পাটলীপুত্রে স্বয়ং সম্রাট অশোকের আহ্বানে। কথিত আছে, এই সভাতেই ত্রিপিটকের শেষাংশ—'অভিধম্ম পিটক' সঙ্কলিত হয়। মতপার্থক্য সত্বেও আরও প্রায় তিনশ' বৎসর-কাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দুটি পৃথক শাখা জন্মগ্রহণ করেনি। সেটা ঘটল চতুর্থ সম্মেলনের পর, দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে। এই শেষ বৌদ্ধ সম্মেলনেব আহ্বায়ক ছিলেন কুশানরাজ সম্রাট কনিষ্ক, সম্মেলনের স্থান পাঞ্জাবের জলন্ধর, এবং সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মহা-অর্হৎ অশ্বঘোষ। এই সভায় নবীনপন্থীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে প্রমাণিত হলেন। তাঁরাই জয়ী হলেন, নিজেদের বললেন—'মহাযানী' এবং প্রাচীনপন্থী স্থবিরবাদীদের 'হীনযানী' নামে অমর্যাদাসূচক অভিধায় চিহ্নিত করলেন। বলা বাহুল্য স্থবিরবাদীরা নিজেদের 'হীনযানী' মনে করেন না, তাঁরা নিজেদের বলেন, 'স্থবিরবাদী' বা 'থেরবাদী'।

অতঃপর থেরবাদীদের চিন্তাধারা বহির্ভারতে প্রসারলাভ করতে থাকে—সিংহলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপে, চীনে ও জাপানে বৌদ্ধধর্মের ঐ 'থেরবাদী' বা তথাকথিত 'হীনযানী মতবাদ বিকশিত হতে থাকে। থেরবাদীরা বিনয়, শীল এবং চারিত্রিক শুচিতার দিকেই বেশী জোর দিতেন—মূর্তিপূজার দিকে নয়। তাঁরা বুদ্ধমূর্তি আদৌ নির্মাণ করাতেন না—বুদ্ধের প্রতীক হিসাবে বিভিন্ন চিহ্নের পূজা করা হত। স্তূপ, পদচিহ্ন, শূন্য-সিংহাসন, ধর্মচক্র, ত্রিরত্ন, বোধিদ্রুম প্রভৃতি।

চীনখণ্ডে স্থবিরবাদী বা 'থেরবাদী' বৌদ্ধধর্মের ভগীরথ বস্তুত, কাশ্যপমাতঙ্গ এবং তাঁর সমসাময়িক ধর্মরত্ন। আমাদের কাহিনীর কালের প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্বে তাঁরা অভিধম্ম প্রচারে চীনদেশে যাত্রা করেন। কাশ্যপমাতঙ্গ চীনা ভাষায় রচনা করেছিলেন এক অমূল্য গ্রন্থ: দ্বাচত্বারিংশ সূত্র। কোন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ নয়, থেরবাদী ধর্মের মূল বক্তব্যটুকু দ্বা-চত্বারিংশৎসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন তিনি।

হান সম্রাটের তদানীন্তন রাজধানী 'লো-য়াঙ'-এ ওঁদের জীবিতকালেই গড়ে ওঠে এক সঙ্ঘারাম, চীনখণ্ডে সদ্ধর্মের প্রথম কেন্দ্র, 'পাই-মাৎ-জু' বা 'শ্বেতাশ্ব সঙ্ঘারাম' কথিত আছে—দুই পরিব্রাজক কাশ্যপমাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন যে অশ্বপৃষ্ঠে আদি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি চীন দেশে নিয়ে যান তার বর্ণ ছিল শ্বেত—তাই ঐ নাম।

সে যাই হোক, আমাদের কাহিনীর কালে চীনে মহাযান ধর্ম অনুপ্রবেশ করেনি। চীনের তদানীন্তন রাজধানী হোয়াঙ-হো তীরে 'চাঙ-য়াঙে'। চীনসম্রাট ফু কিয়েন ছিলেন পরম থেরবাদী বৌদ্ধ। তিনি শুনলেন—তথাগত বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—সে ধর্মের নাম মহাযান। সম্রাট এ বিষয়ে অবহিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পণ্ডিতেরা বললেন, মধ্য এশিয়া তথা ভারত ভূখণ্ডে এ বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত হচ্ছেন কুচী-সঙ্ঘারামের মহাস্থবির কুমারজীব। সুতরাং চীনসম্রাট ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—এই পণ্ডিতকে তাঁর অবিলম্বে চাই। তাঁকেই তিনি 'কুয়ো-শী' (রাজগুরু) করবেন।

মহামান্য চীনসম্রাটের দূত এল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জনপদনায়ক কুচীরাজের দরবারে। সবিনয়ে পো-সাঙ জানালেন—মহাস্থবির কুমারজীব বৃদ্ধ, দুরতিক্রম্য গোবি মরুভূমি উত্তরণ এ বয়সে তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তদুপরি তিনি কুচীরাজের ভাগিনেয়। চীনসম্রাট যেন তাঁকে মার্জনা করেন।

বৌদ্ধ হলে কি হয়, চীনসম্রাটের ধমনীতে সহস্রাব্দীর আভিজাত্যের অভিমান। অপমানিত বোধ করলেন তিনি। তৎক্ষণাৎ আদেশ করলেন—যেমন করেই হোক কুমারজীবকে নিয়ে যেতে হবে চীন রাজধানীতে। ঠিক কী ভাষায় তিনি আদেশটা জারী করেছিলেন ইতিহাসে সে কথা নেই। ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় হেনরী যেমন একদিন তিক্ত-বিরক্ত হয়ে বলে ফেলেছিলেন—'আমার অনুচরদলের মধ্যে এমন কেউ কি নেই যে ঐ টমাস বেকেটের ঔদ্ধত্য থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে ?' হয়তো চীনসম্রাটও তেমনি কিছু বলে থাকবেন উত্তেজনার মুহূর্তে। ফল হল মারাত্মক। দুর্ধর্ষ চীনা সৈন্যাধ্যক্ষ হো-লুস্থন এক বিপুলবাহিনী নিয়ে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করলেন, হয়তো চীনা সম্রাটের অজ্ঞাতসারেই—কুমারজীবকে ছিনিয়ে আনতে।

অচিন্ত্যনীয় পরিস্থিতি ! একদিকে মহাচীনের প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট, অন্যদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কুচীরাজ ! তবু ক্ষাত্রধর্মে আঘাত লাগল পো-সাঙ-এর। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন তিনি। কুমারজীব বারম্বার অনুরোধ করলেন মাতুলকে—কিন্তু পো-সাঙ দৃঢ়সংকল্প। দুর্গ-কুড্য সংস্কার করা হল, নূতন পরিখা খনন করা হল। পর্বতশীর্ষগুলিতে নূতন মঞ্চ নির্মাণ করে নিত্যপ্রহরার ব্যবস্থা হল। শস্ত্র-কর্মকারগণ

দীর্ঘদিন পরে স্ব স্ব অঙ্গারচুল্লী প্রজ্বলিত করে। প্রসবযন্ত্রণায় যেন আর্তনাদ করতে থাকে চর্ম-প্রবেসিকা ভস্ত্রা; সদ্যোজাত শূল, ভল্ল, বাণ, খড়্গ শস্ত্র-শিল্পীর সূতিকাগারে সজ্জিত হতে থাকে।

দিন দিন অশান্ত হয়ে উঠছেন কুমারজীব। চৈনিক সৈন্যবাহিনী রেশম-সড়ক ধরে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হয়ে আসছে। দ্রুতগামী বার্তাবহের মাধ্যমে যে সংবাদ পাওয়া গেল তা ভয়াবহ। চীনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এক অক্ষৌহিণী, কুচীরাজের সামরিক শক্তি মাত্র দুই অনীকিনী—অর্থাৎ চীনা-বাহিনীর শক্তি প্রায় পাঁচগুণ। চীনা সৈন্যাধ্যক্ষ হো-লুস্থুন জাতিতে হুণ—তার নৃশংসতা তুলনাহীন। সে বৌদ্ধ নয়। হুণ জাতির প্রকৃষ্ট পরিচয় তখনও ভারতবর্ষ পায়নি। মধ্য এশিয়াতেও সে তথ্য অপরিজ্ঞাত। হুণশক্তির প্রথম বিষোদ্গার হুণরাজ 'এ্যাটিলা'-র জন্ম আলোচ্য সময়কালের পরে, শতাব্দীর প্রায় একপাদ পরে। তবু সার্থবাহ বণিকদের মাধ্যমে হুণজাতির নির্দয়তার কিছু কিছু পরিচয় ওঁরা পেয়েছেন। কুমারজীবের শাস্ত্রপাঠ বন্ধ আছে; তিনি নিরন্তর প্রাচীন পুঁথির অনুলিপি করে যাচ্ছেন। তাঁর আশঙ্কা—এই রণতাণ্ডবে তাঁর সঙ্ঘারামে রক্ষিত অমূল্য গ্রন্থগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই অনুলিপি রেখে একে একে মূল গ্রন্থগুলি তিনি কাশগড়ে অর্হৎ বুদ্ধযশস্‌কে প্রেরণ করছিলেন। তাঁকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন—শৈলদেশও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখলে অর্হৎ বুদ্ধযশস্‌ যেন মূল পুঁথিগুলি পুরুষপুর অথবা তক্ষশীলার সঙ্ঘারামে সুরক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন।

অতঃপর একদিন মধ্যরাত্রে সিদ্ধান্তে এলেন কুমারজীব।

সন্ধ্যাকাল থেকেই সঙ্ঘারামের অলিন্দে পদচারণা করছিলেন আর মনে মনে বলছিলেন: 'হে লোকজ্যেষ্ঠ! হে শাক্যসিংহ! তুমি আমাকে পথের নির্দেশ দাও। কী ভাবে এই অনিবার্য রক্তপাত বন্ধ করতে পারি আমি?' পূর্বদিন সংবাদ এসেছে—চৈনিক সৈন্য পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে স্কন্ধাবার স্থাপন করেছে। কুচী পর্বতচূড়ায় উঠে তিনি গভীর রাত্রে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন—পশ্চিম দিগ্বলয়ে অসংখ্য আলোকবিন্দু। দিবাভাগে দেখা যায়, সেস্থলে দূর নীলাকাশে গণনাতীত ক্রমাগত সঞ্চরমান বিন্দু। খাদ্যসন্ধানী চিল্ল-শকুনী-গৃধিনীর পক্ষপাল!

রাত্রির তৃতীয় যাম। নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করলেন মহাস্থবির; সিদ্ধান্তে এসেছেন এতক্ষণে। এ ছাড়া উপায় নাই। প্রথমেই তাঁর প্রিয় গ্রন্থগুলির ভিতর সুনির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থ একটি পেটিকায় বেঁধে নিলেন। মান্দুরা থেকে প্রিয় অশ্বটিকে নিয়ে সঙ্ঘারাম ত্যাগ করে একাকী নিষ্ক্রান্ত হলেন পথে।

এক আকাশ নক্ষত্র। কিন্তু সে নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই।

এ বঙ্গভূমের নৈশাকাশে অরোরা-বোরিয়ালিস্-এর মত সেই তাকলামাকান মরুভূমির একান্তে অবস্থিত কুচী নগরীর আকাশে মেঘও দুর্লভ বস্তু। ধূলিহীন, জলীয়বাষ্পহীন সে আকাশে নক্ষত্রের দ্যুতি অনির্বচনীয়। সে নক্ষত্রের আলোয় অমাবস্যা রাত্রিও নীরন্ধ্র অন্ধকার নয়।

প্রায় অর্ধদণ্ডকাল গিরিসঙ্কটের উপলবন্ধুর পথ অতিক্রম করে মহস্থবির উপনীত হলেন আ-লী বিহারের প্রবেশদ্বারে। দুই-তিনবার করাঘাতের পরে কাষ্ঠ-নির্মিত প্রবেশদ্বারে একটি চারি অঙ্গুলিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র গবাক্ষ দৃষ্ট হল। ভিতর থেকে প্রশ্ন হল : কে আপনি ? রাত্রির শেষযামে এ সঙ্ঘারামের শান্তি বিনষ্ট করছেন কেন ?

কুমারজীব বললেন, আমি কুচী-সঙ্ঘারামের 'থের'। দ্বার উন্মোচন কর বুদ্ধক্ষেমা।

তৎক্ষণাৎ বিহারকুড্যের উর্ধ্বে একটি মশাল জ্বলে ওঠে। প্রহরারতা ভিক্ষুণী বুদ্ধক্ষেমা দ্বার উন্মোচন করে সবিস্ময়ে বলে, ভগবন্! আপনি ?

: হ্যাঁ। দ্বার রুদ্ধ কর। আমার এ আগমন সংবাদ যেন গোপন থাকে। অগ্‌গবিনতাকে জাগরিত কর। অত্যন্ত গোপন এবং অত্যন্ত জরুরী কিছু গুহ্যতত্ত্ব তাঁকে এই দণ্ডেই জ্ঞাপন করতে চাই।

ভিক্ষুণী বুদ্ধক্ষেমা বলে, মহাভাগ! আপনি আমার অনুগমন করুন। ভদন্তিকা অগ্‌গবিনতা জাগরিতাই আছেন। কিয়ৎকাল পূর্বে আমি তাঁকে শাস্ত্রপাঠরতা দেখেছি।

অক্ষুমতীও নিরতিশয় বিস্মিত হল রাত্রির তৃতীয়যামে মহাস্থবিরের আকস্মিক আবির্ভাবে। অক্ষুমতীর বয়ঃক্রম উনত্রিংশতিবর্ষ। অঙ্গে ত্রিচীবর, মস্তক মুণ্ডিত, সর্বাঙ্গে তিলমাত্র আভরণ নাই। তবু এখনও অপূর্ব রূপবতী তিনি। সে রূপে ঘূর্ণ্যমান হীরকখণ্ডের চকিত আলোকবিচ্ছুরণ নাই, আছে নীরন্ধ্র পরিবেশে ঘৃত-প্রদীপের অচঞ্চল দীপ্তি। উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনে শীর্ণকায়া, তৎসত্ত্বেও তাঁর কমনীয় সৌন্দর্য এক অপার্থিব স্বর্গীয় দ্যুতিতে পরিমণ্ডিত। অগ্‌গবিনতা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন সঙ্ঘারামের অর্হৎ-প্রধানকে।

কুমারজীব আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন, অগ্‌গবিনতা, আমি এক মহা-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি; সঙ্ঘারামের কুশল চিন্তা করে আমি সে সিদ্ধান্তের কথা গোপনে আপনাকে নিবেদন করতে এসেছি।

: আদেশ করুন মহাভাগ ?

নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করে মহাস্থবির সহসা অন্তরঙ্গ হলেন। বললেন, অক্ষুমতী! প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এক নিশীথ রাত্রে ঠিক এই

ভাবে তুমি আমার পরিবেশে উপস্থিত হয়েছিলে। সেদিন তুমিও এক মহাসিদ্ধান্তে কৃতসংকল্প ছিলে। মনে আছে ?

: আছে মহা-থের।

: সেদিন তোমার সঙ্গে আমার কী কথোপকথন হয়েছিল মনে পড়ে ?

: পড়ে মহা-থের। আমি আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ক্রৌঞ্চীর দুঃখে আদিকবি যেমন করুণার উৎসমুখে স্বত-উৎসারিত শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ কবিতার জন্ম দিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে আপনি মুখে মুখে রচনা করে আমাকে একটি অপূর্ব শ্লোক শুনিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ধম্মপদ থেকে বহু মন্ত্রগাথা শুনিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—জীবনের কোনও পর্যায়েই মৃত্যুর মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে নেই। বলেছিলেন,

"যথা বুব্‌বুলকং পস্‌সে যথা পস্‌সে মরীচিকং।
এবং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্‌চু রাজা ন পস্‌সতি ॥[৫]

আরও বলেছিলেন,

"সব্বসো নামরূপস্মিং যস্‌স্ নত্থি মমায়িতং।
অসতা চ ন সোচতি স বে ভিখ্‌খু'তি বুচ্‌চতি ॥"[৬]

একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে কুমারজীবের কণ্ঠস্বর। বলেন, ধম্মপদের শ্লোকগুলি স্মরণে আছে। কিন্তু পালি নয়, সংস্কৃতে যে শ্লোকটা তখন মুখে-মুখে রচনা করেছিলাম সেটি কী ?

: আপনি আবৃত্তি করেছিলেন—

"পরীক্ষণার্থময়ি রুদ্রমূর্তে
সমাগতাদ্ ভীতিলবোঽপি নাস্তি।
ইদং হি বক্ষঃ প্রস্তুতং চিরায়
তবাশ্রুপাতং করুণেতি মন্যে ॥"[৭]

প্রশান্ত হাস্যে উজ্জল হয়ে উঠল মহাস্থবিরের আনন। যেন তপশ্চারণক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর নির্মোক ভেদ করে অতীতের এক রাজকুমারের পুনর্জন্ম হল: যেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁর অনুজার নিকট শেষ বিদায় নিতে এসেছেন। ভিক্ষুণীর যুক্তকর নিজ করমুষ্টিতে গ্রহণ করে কুমারজীব বললেন, অক্ষমতী, ঐ শ্লোকটা আজ কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। তোর মুখে ওটা শুনতেই তাই এসেছি।

বিস্মিতা অক্ষমতী বলে, শুধু এই জন্য ?

: না। ওটা তো বীজমন্ত্র। অতঃপর ব্যাখ্যা। আমি সিদ্ধান্তে এসেছি অক্ষমতী—

মহাস্থবিরের সিদ্ধান্তের কথা শুনে বিস্মিতা হল অক্ষুমতী। বোধ করি এমনই কিছু সে আশঙ্কা করেছিল। শান্তস্বরে বললে, সম্ভবত এ ভিন্ন সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় পথ নেই। কিন্তু আপনি কি এই দণ্ডেই সঙ্ঘারাম ত্যাগ করছেন?

: হ্যাঁ। আশা করি কাল অপরাহ্নের পূর্বেই চৈনিক স্কন্ধাবারে উপনীত হতে পারব। আমারই জন্য এ সমরায়োজন। আমি গোপনে চৈনিক সেনাপতির কাছে আত্মসমর্পণ করলে যুদ্ধের প্রয়োজনও শেষ হবে। কুচীরাজের ক্ষাত্র অভিমানেও আঘাত লাগবে না।

: কিন্তু মহা-থের! চীনদেশ শুনেছি এক বৎসরের পথ। আর কি কোন-দিন এ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন?

: সম্ভবত নয়। এই হয়তো তোর আমার শেষ সাক্ষাৎ। কিন্তু সেজন্য দুঃখ কিসের অক্ষুমতী? 'চু-কালান' এবং 'চিয়া-য়েহ-মোৎয়েঙ'ও তাঁদের জন্ম-ভূমিতে ফিরে আসেন নি।

: ওঁরা দুজন কে? আমি কোন দিন তাঁদের নাম শুনিনি।

: 'চু-কালান' হচ্ছেন অর্হৎ ধর্মরত্ন; আর 'চিয়া-য়েহ-মো-ৎ‍য়েঙ' হচ্ছেন মহাজ্ঞানী কাশ্যপমাতঙ্গ। দুজনেই মধ্যভারতীয় পণ্ডিত। চীনখণ্ডে হীনযান ধর্মের ভগীরথ। চীনা ইতিহাসে তাঁদের নাম ঐ অভিধায়। সম্ভবত আমিও চীনখণ্ডে নূতন নাম-রূপ লাভ করব।

শুধু ভিক্ষুণী আর মহা-থের নয়, ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যেও অনেক কথা হল। শেষে কুমারজীব বললেন, অক্ষুমতী, আমি কাশগড়ে অর্হৎ বুদ্ধযশস্‌কে এই সঙ্ঘা-রামে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি; বলেছি আমার অবর্তমানে তিনি যেন এ সঙ্ঘারামের মহাস্থবিররূপে অধিষ্ঠিত হন। তুমি অগ্‌গবিনতা হওয়ায় অতঃপর তাঁরই আজ্ঞাবহ হিসাবে—

বাধা দিয়ে ভিক্ষুণী বলেন, মার্জনা করবেন মহা-থের! সেটা কি আদৌ বাঞ্ছনীয়? আপনি তো সকল কথাই অবগত আছেন। উনি এ সঙ্ঘারামে অধিষ্ঠিত হলে আমার কি অন্যত্র প্রস্থান করাই সমুচিত হবে না?

: না, অক্ষুমতী। আমি যে সকল কথাই অবগত আছি। আমি যে বিশ্বাস করি—আত্মহনন নয়, আত্মনিবেদনই তোমাদের দুজনের চরম লক্ষ্য! তোমরা দুজনেই 'নামরূপ'-বন্ধন অতিক্রম করেছ!

স্থবিরের পদপ্রান্তে ভূলুণ্ঠিতা হয় প্রাক্তন রাজকন্যা। বলে আশীর্বাদ করুন মহাভাগ। ঐ মন্ত্র যেন সার্থক হয় আমার জীবনে।

মহাস্থবির নিমীলিতনেত্রে যুক্তকরে শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করলেন:

"পরীক্ষণার্থময়ি রুদ্রমূর্তে
সমাগতাদ্ ভীতিলবোঽপি নাস্তি।
ইদং হি বক্ষঃ প্রসৃতং চিরায়
তবাস্ত্রপাতং করুণেতি মন্যে॥"

চৈনিক স্কন্ধাবারে সেনাপতির সম্মুখে যখন উপনীত হলেন তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। বিপুল সেনাবাহিনীর কেন্দ্রস্থিত সেনাপতির শিবিরে উপনীত হতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল তাঁকে; তবু 'কুচীরাজের দূত' এই পরিচয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় সেনাপতি সমীপে আনা হল। উষ্ট্রচর্ম-নির্মিত প্রকাণ্ড শিবির। সিংহাসনাদির কোন আয়োজন নাই। ভূমির উপরে স্থূল আস্তরণ বিস্তৃত। তদুপরি সেনাপতির জন্য উচ্চ গদির শয্যা। স্থূণ সেনাপতি হো-লুস্‌হ্ন একটি উপাধানে কফোনি স্থাপিত করে অর্ধশায়িত অবস্থায় আলবোলা সেবন করছেন। গঞ্জিকা, সম্বিদা অথবা তামাকু —কী তা বোঝা যায় না; পরন্তু সেনাপতির চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ। একজন সম্বাহক তাঁর পদসেবা করছে, একজন সুদর্শনা যৌবনবতী যবনী চামর-ব্যজন করছে। সেনাপতির সম্মুখে পানপাত্র এবং ভৃঙ্গার। একটি সুবর্ণ পাত্রে কিছু শূল্যপক্ক মাংস। দুই পার্শ্বে দুইজন সন্নদ্ধ দেহরক্ষী মুক্ত কৃপাণহস্তে প্রহরারত।

শিবিরদ্বারের চীনাংশুক অবরোধ উত্তোলিত করে প্রহরীবেষ্টিত কুমারজীব কক্ষমধ্যে পদার্পণ মাত্র অট্টহাস্য করে ওঠেন চীনা সেনাপতি। কুমারজীব বিস্মিত হন, অট্টহাস্যের হেতুটা প্রণিধান করে উঠতে পারেন না। প্রহরী তাঁর কর্ণমূলে বলে, অভিবাদন কর্ মূর্খ!

তা ঠিক। এতাবৎকাল যখনই কোন সেনাপতি বা নৃপতির সম্মুখস্থ হয়েছেন, প্রণাম পেয়েছেন এবং আশীর্বাদ করেছেন। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। কুমারজীব অনভ্যস্ত নতিস্বীকার করলেন।

সেনাপতির অট্টহাস্যের হেতুটা বোঝা গেল তাঁর প্রথম সম্ভাষণেই: তোর রাজার কি এই অবস্থা? দৌত্যগিরি করবার মত উপযুক্ত পোশাকও তোকে দিতে পারেনি?

পরিষ্কার পালিভাষা। চীনা নয়। অর্থ গ্রহণে কোন অসুবিধা হয় না

কুমারজীবের। বস্তুত কোন চীনা সমরনায়ক যখন মধ্য-এশিয়ার রণাঙ্গণে প্রেরিত হতেন তখন পালিভাষাজ্ঞান তাঁর আবশ্যিক গুণ বলে বিবেচিত হত। সে জন্যই এই সৈনাধ্যক্ষ কুমারজীবের বোধগম্য ভাষায় বাক্যালাপে সমর্থ; কিন্তু বোঝা গেল মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধ অর্হৎ-এর সম্মান সম্বন্ধে সেনাপতির কোন ধারণা নেই। শুধু মধ্য-এশিয়া কেন—ঐতিহাসিক এইচ সরকার বলেছেন, "ৎসিন যুগেই (২০০-৩১৭ খ্রীষ্টাব্দে) চীন-ভূখণ্ডে অন্যূন সতের হাজার হীনযানী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম গড়ে উঠেছিল।" কিন্তু হুণ সেনাপতি তো বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ পাঠের জন্য পালিভাষা শেখেননি, নিতান্ত যুদ্ধের প্রয়োজনে এ ভাষা আয়ত্ত করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর জীবন কেটেছে—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ত্রি-চীবর সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা ছিল না।

কুমারজীব সবিনয়ে বললেন, হে মহান চৈনিক সেনাপতি! আমি শ্রীমন্ মহারাজ পরম ভট্টারক কুচী অধিপতির দূত নই। আমি এখানকার সঙ্ঘারামের মহাস্থবির মাত্র; আমি—

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন হো-লুস্যন, তবে কোন্ সাহসে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আমার কাছে এসেছিস্?

: যেহেতু শুনেছি আপনি আমারই সন্ধানে এসেছেন। আমার নাম—কুমারজীব!

ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করেন সেনাপতি। তাঁর হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হয়। বিরলকেশ ভ্রূযুগলে জাগে কুঞ্চন। হনুর অস্থি দৃঢ়নিবদ্ধ হয়। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণে বলেন, এ কথা সত্য?

: বৌদ্ধ অর্হৎ মিথ্যা বলে না মহা-সেনাপতি।

: কিন্তু তুই ছদ্মবেশী গুপ্তচর কিনা তাই বা বুঝব কি করে? প্রমাণ দিতে পারিস—যে তুই সেই 'কুমারজীব', যাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার জন্য এ সমরায়োজন?

: না মহাভাগ। কিন্তু আমি যে অনৃতভাষণ করছি না এ সত্য আপনি সহজেই যাচাই করে নিতে পারবেন। আমার একান্ত অনুরোধ—যে উদ্দেশ্যে আপনার আগমন তা যখন সিদ্ধ হল তখন কুচী নগরের দিকে নয়—চীনখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করুন। আমি মহামহিম চীন সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

চীনা সেনাপতি বাহুবদ্ধবক্ষে শিবিরের এ-প্রান্ত হতে ও-প্রান্তে অশান্তভাবে পদচারণা করলেন কিয়ৎকাল। তারপর সন্নিধাতাকে সম্বোধন করে বললেন, গতকাল খ্যিজিল সঙ্ঘারামে ধৃত দুইজন বন্দীর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম—তারা কি জীবিত?

যুক্তকরে সবিনয়ে সন্নিধাতা প্রত্যুত্তর করে, আজ্ঞে হ্যাঁ মহাপতি। অদ্য সন্ধ্যাকালে তাদের শূলদণ্ডে উপস্থাপিত করার কথা। তারা জীবিত।

: সেই দুইজন বন্দীকে অবিলম্বে এই শিবিরে আনা হল। শিহরিত হয়ে ওঠেন কুমারজীব। বন্দীদ্বয় আর কেহ নয়—অর্হৎ পুণ্যক এবং বিধুরক্ষেম, অর্থাৎ খ্যিজিল সঙ্ঘারামের দুইজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। তাঁরা দুইজনেও চমকিত হলেন কুমারজীবকে দেখে। শৃঙ্খলিত হস্তদ্বয় জোড় করার উপায় নেই। তাই লুটিয়ে পড়েন ভূতলে। বলেন, মহা-থের! আপনি এখানে?

হো-লুস্থন গর্জন করে ওঠেন, বাচালতার স্থান এ শিবির নয়। যা প্রশ্ন করছি তার প্রত্যুত্তর কর্। এঁকে তোরা সনাক্ত করতে পারিস্?

বিধুরক্ষেম বলেন, মধ্য-এশিয়ায় এঁকে না চেনে কে? ইনি কুচী সঙ্ঘারামের মহাস্থবির অর্হৎ কুমারজীব—যাঁকে সসম্মানে চীন সম্রাটের দরবারে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যেই আপনার আগমন।

: যথেষ্ট। এদের নিয়ে যাও।

প্রহরীগণ বন্দী দুজনকে নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হতেই কুমারজীব বলেন, মহা-সেনাপতি। এঁদের আপনি বন্দী করেছেন কেন? কী এঁদের অপরাধ?

: গতকাল চীনা সৈন্যরা যখন খ্যিজিল রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠনে যায় তখন ঐ দুই বর্বর তাদের বাধা দিয়েছিল। তাই ওদের শূলে দেওয়ার আদেশ দিয়েছি।

আর্তনাদ করে ওঠেন মহাস্থবির—না, না, না। এমন দুষ্কর্ম করবেন না মহা-সেনাপতি। এঁরা পরম ধার্মিক, বৌদ্ধ শ্রমণ, এঁদের অনিষ্ট হলে চীন সম্রাট আপনাকে কখনও ক্ষমা করবেন না।

হো-লুস্থন বলেন, তুই মহামহিম চীন সম্রাটকে চিনিস? চোখে দেখেছিস?

: না। কিন্তু শুনেছি তিনি পরম বৌদ্ধ। কোনও বৌদ্ধশ্রমণের উপর অত্যাচার করলে—

বাক্যটা তাঁর সমাপ্ত হয় না, তৎপূর্বেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে হূণ সমরনায়কের।

প্রথম মুষ্ট্যাঘাতেই ভূতলশায়ী হয়েছিলেন বৃদ্ধ। দৈহিক আঘাতের অপেক্ষা ব্যথা পেয়েছিলেন অন্তরে। বৌদ্ধ চীন সম্রাটের সেনাপতির নিকট এ-জাতীয় সম্বর্ধনা তাঁর কল্পনাতীত। সমগ্র মধ্য-এশিয়ার সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মহাস্থবির ধীরে ধীরে ভূতল থেকে উত্থিত হওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর খড়্গনাসা থেকে দর-বিগলিত ধারায় রক্তপাত হচ্ছিল। নতজানু অবস্থাতে বললেন, সেনাপতি! আমি পুনরায় অনুরোধ করছি—ঐ শ্রমণদ্বয়কে মুক্তি দিন।

এবার ওঁর উদরদেশে প্রচণ্ড পদাঘাত করলেন হো-লুস্থন। নাসিকা নয়, এবার

মুখবিবর থেকে নির্গত হয়ে এল এক ঝলক রক্ত। সমস্ত শিবিরটা দুলতে থাকে— ক্রমে ক্রমে চেতনা অবলুপ্ত হয়ে আসছে মহাস্থবিরের। রক্তাক্ত মুখে তিনি অস্ফুটে কী যেন বললেন—বোঝা গেল না। হয়তো ওঁর অন্তর্যামী শুনতে পেলেন। না, কোন অভিশাপ নয়, সংজ্ঞা হারানোর পূর্বমুহূর্তে বৃদ্ধ বলেছিলেন: "অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে…"৮

দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। হয়তো চিকিৎসা হলে, জলসিঞ্চন হলে, তার পূর্বেই জ্ঞান ফিরে আসত, কিন্তু তা আসেনি। জ্ঞান হল যখন তখন কুমারজীব দেখলেন তিনি এক পর্বতচূড়ায় একটি বৃক্ষকাণ্ডের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন। উন্মুক্ত জনহীন পর্বতশীর্ষে। কিছুদূরে কয়েকটি প্রহরী শুষ্কশাখায় অগ্নিসংযোগ করে হস্তপদাদি উত্তপ্ত করছিল। সন্ধ্যা সমাগত। চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করলেন কুমারজীব। সহসা একটি মর্মান্তিক দৃশ্যে হাহাকার করে ওঠেন। পঞ্চাশ হস্ত পরিমাণ দূরে পাশাপাশি দুটি শূলদণ্ডে বিদ্ধ দুটি নগ্নপ্রায় মৃতদেহ। মৃত্যুযন্ত্রণায় তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্তি বিনষ্ট হয়েছে। তাঁরা দুইজন হচ্ছেন খ্যিজিল সজ্ঘারামের দুইজন অর্হৎ—বিধুরক্ষেম এবং পুণ্যক!

বহুক্ষণ কুমারজীব মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে স্থির হয়ে থাকেন। প্রচণ্ড তৃষ্ণা বোধ করছিলেন। মর্মবিদারক দৃশ্যটি না দেখলে হয়তো তিনি প্রহরীদের কাছে পানীয় জল ভিক্ষা করতেন। এখন তাও পারলেন না।

এখানেই যদি যন্ত্রণার শেষ হত, তাহলেও হয়তো শান্ত হতেন মহাস্থবির— কিন্তু তারপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল পার্বত্য উপত্যকার পরপারে। এ পর্বতশিখর থেকে কুচী নগরীর হর্ম্যরাজি পরিদৃশ্যমান। কুমারজীব দেখলেন—সমগ্র কুচী জনপদ এক ভীষণা বহ্ন্যুৎসবে অবলুপ্ত। রাজপ্রাসাদ, মহা-সজ্ঘারাম, আ-লী বিহার প্রভৃতিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না—কিন্তু এক দিগন্তব্যাপী অগ্নিকাণ্ডে সহস্র বৎসরের ঐতিহ্য নিয়ে কুচী জনপদ অঙ্গারে পরিণত হচ্ছে! হুণ সেনাপতি জীবিতাবস্থায় কুমারজীবকে এভাবে গ্রেপ্তার করতে না পারলে বোধ করি ঐভাবে নির্বিচারে প্রতিটি গৃহে অগ্নিসংযোগ করত না।

হাহাকার করে উঠলেন বৃদ্ধ: হে লোকজ্যেষ্ঠ! হে শাক্যনন্দন! এ তুমি কী করলে!

* * *

এই স্থলে কিছু স্বীকৃতির প্রয়োজন অনুভব করছি। কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন কুমারজীবের যেটুকু ইতিহাস সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে হুণ সেনাপতির হস্তে তাঁর দৈহিক নিপীড়নের বিস্তারিত বিবরণ নাই। অগ্নিদগ্ধ কুচী নগরীর দিকে দৃক্‌পাত করে

সেই সন্ধ্যায় বৃদ্ধ শ্রমণের গণ্ডে রক্তধারা অশ্রুর প্লাবনে ধৌত হয়েছিল কি না— ইতিহাস সে বিষয়ে নীরব। এ শুধু ঔপন্যাসিকের কল্পনা। তবু বিশ্বাস করি— পাঠক এ বিষয়ে কথাসাহিত্যের অপেক্ষা ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি বেশী আগ্রহান্বিত। তাই বলি—ইতিহাস শুধু বলেছে "বন্দী-জীবনের প্রথমাংশে কুমারজীব চীনা সেনাপতির নিকট নিদারুণভাবে নিগৃহীত হন ; তারপর নানা কারণে তিনি চীনা সেনাপতির বিশ্বাসভাজন এবং শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন।" ঐ-টুকু তথ্যের ভিত্তিতে 'নিদারুণ নিগ্রহে'র আলেখ্য এঁকেছি ; এবার আপনারা অনুমতি করলে 'নানা কারণে' কী ভাবে তিনি 'চীনা সেনাপতির বিশ্বাসভাজন এবং শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন' তাঁর চিত্র আঁকতে পারি :

* * *

প্রায় তিন মাস পরের কথা। মকররাশির ভাস্কর এখন পুনরায় মেষরাশিস্থ হয়েছেন। এ তিন মাস কাল চীনা অক্ষৌহিনীর সঙ্গে কুমারজীব ক্রমাগত চলেছেন পূর্বাভিমুখে। প্রথম প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁকে পল্যাঙ্কিকায় বহন করা হত। এক্ষণে তাঁকে একটি অশ্ব দেওয়া হয়েছে। দিবাভাগে তাঁর হস্তপদাদিও শৃঙ্খলিত করা হয় না। সন্ধ্যা সমাগমে ভারপ্রাপ্ত প্রহরী প্রথামাফিক তাঁকে নৈশ শিবিরের কেন্দ্রস্থ স্তম্ভের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। সাত বৎসর বয়সে যিনি সংস্কৃত ও পালিভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, এ তিন মাসে তিনি যে চীনাভাষায় প্রাথমিক কথোপকথনে অভ্যস্ত হবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বন্দীর পলায়নের কোনও উদ্যোগ যে নেই এ তথ্যটা সকলেই অনুধাবন করেছে। তদ্ভিন্ন পলায়নের পথও নাই সে বিজন গিরিসঙ্কটে। বিরাট বাহিনী এতদিনে অগ্নিদেশের (কারাহুশর) মরুস্থান অতিক্রম করেছে, তুরফান মরুজনপদও অতিক্রান্ত। পরবর্তী বৃহৎ জনপদ— চীনের সিংহদ্বার : তুন-হুয়ান। অর্থাৎ এক্ষণে দুরতিক্রম্য গোবি মরুভূমির দক্ষিণাংশ অতিক্রম করতে হবে। সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মে যাত্রাকালে কখনও কখনও সৈন্যবাহিনী দশ ক্রোশ দীর্ঘ হয়ে যায়। তখন পুরোভাগের কোন সংবাদ পশ্চাদ-ভাগে প্রেরণ করতে সমস্ত দিনমান সময় লাগে। কুমারজীব আছেন বাহিনীর মধ্যবর্তী অংশে। বস্তুত খাদ্য, ধনভাণ্ডার, বন্দী ও লুণ্ঠিত সম্পদ সর্বক্ষণই এই মধ্যবর্তী স্থানে থাকে। সমরনায়ক হো লুস্থনের শিবিরও বাহিনীর এই অংশে অবস্থিত অবস্থাতেই নিত্য সঞ্চরমান। অন্যান্য বন্দীদিগের সঙ্গে কুমারজীবের কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই—এ বিষয়ে সেনাপতির কঠিন নিষেধ ছিল। কিন্তু এই তিন মাসে কুমারজীব তাঁর চতুষ্পার্শ্বের প্রহরীদিগের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তিনটি কারণে। প্রথমত, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অমায়িক ব্যবহার—করুণা, মৈত্রী ও

অহিংসার ফলশ্রুতি। দ্বিতীয়ত, চীনাবাহিনীতে কিছু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীও ছিল। সেনাপতি না প্রণিধান করলেও তারা তাঁর মূল্য কিছুটা বুঝেছিল। মহাস্থবিরের প্রার্থনা সভায় তারা নিত্য উপস্থিত হত। তৃতীয়ত, কুমারজীব ছিলেন ভেষগাচার্যও —চরক-সুশ্রুত পাঠই শুধু নয়, পার্বত্য অঞ্চলের লতাগুল্ম নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নানান জাতের ঔষধ প্রস্তুত করতেন। সে ঔষধ নাকি ছিল অব্যর্থ। বস্তুত তাঁর একান্ত-প্রহরী—যার ব্যক্তিগত প্রহরায় তিনি চীনখণ্ডে নীত হচ্ছেন সেই চিয়াঙ তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েছিল ঐ কারণেই। দীর্ঘদিনের ব্যাধি থেকে কুমারজীব তাকে ঔষধ প্রয়োগে সুস্থ করে তোলেন।

সেদিন রাত্রে মহাস্থবিরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে করতে চিয়াঙ বললে, মহা থের! আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। আমি আদেশের দাস। আমি জানি—আপনি পলায়ন করবেন না, তবু...

বাধা দিয়ে কুমারজীব বললেন, তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন ভাই? তুমি তো তোমার কর্তব্য কর্ম করছ শুধু। প্রতিটি সৈনিককে সেনাপতির আদেশ বিনা-বিচারে পালন করতে হয়।

চিয়াঙ বলে, প্রভু, আপনি উদরপীড়ার কোনও ঔষধ জানেন? আমাদের বাহিনীর একজন উদরদেশে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করছে। কোনও ঔষধ প্রয়োগেই তাঁর আরাম হচ্ছে না—অসহ্য যন্ত্রণা...

এবারও বাধা দিয়ে কুমারজীব বলেন, আমাকে রোগীর সন্নিধানে নিয়ে যেও। তাকে না দেখে কেমন করে ঔষধ প্রযোগ করব?

চিয়াঙ সলজ্জে বলে, তাঁকে দেখলে অথবা পরিচয় জানতে পারলে আপনি আর ঔষধ প্রদান করতে পারবেন না—এ জন্যই তাঁর পরিচয় গোপন রাখছি।

: একথা কেন বলছ চিয়াঙ?

অসঙ্কোচেই বলল চিয়াঙ: তিনি আমাদের মহান সেনাপতি হো-লুস্যন স্বয়ং। যিনি আপনাকে মুষ্ট্যাঘাত করেছিলেন, পদাঘাত করেছিলেন।

স্মিত হাসলেন কুমারজীব। বললেন, তুমি কেমনতর বৌদ্ধ চিয়াঙ? তিনি একদিন আমাকে আঘাত করেছিলেন বলে আমি তাঁর চিকিৎসা করব না! কি বলছ তুমি? শোননি এ মন্ত্র?—

> "অক্‌কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসিবে
> যে চ তং উপনয্‌হন্তি, বেরং তসং ন সম্মতি॥"[৭]

তাই ধম্মপদ বলছেন:

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং
আবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনাতন ।[10]

চিয়াঙ বিস্মিত। বলে, তবে একটু অপেক্ষা করুন প্রভু! আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে আসি। আজ সন্ধ্যাকাল থেকে তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর। যদি সম্ভব হয়, তবে আজ রাত্রেই আপনি তাঁকে পরীক্ষা করে দেখুন।

সেই রাত্রেই চিয়াঙ কুমারজীবকে নিয়ে গেল সেনাপতির শিবিরে। সেনাপতির চৈনিক চিকিৎসক সর্বপ্রকারের ব্যবস্থাদি দিয়েও ওঁর যন্ত্রণার কোন উপশম করতে পারেনি। একজন মধ্য-এশিয়ার চিকিৎসকের ঔষধে রোগী উপকৃত হলে তার অবমাননা। তাই সে কিছুতেই স্বীকৃত হল না। কিন্তু রোগীর জ্ঞান ছিল। বামহস্তে উদরদেশ ধারণ করে শয্যার উপর তিনি এতক্ষণ আর্তনাদ করছিলেন। হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন তিনি, চোপরাও উল্লুক! নিজে কিছুই করতে পারছ না—অথচ আর কোনও চিকিৎসককেও আসতে দিচ্ছ না। তোমাকে শূলে দেব আমি। এ্যাই কে আছিস্? সেই বৌদ্ধসাধুটাকে ধরে নিয়ে আয়।

অনতিবিলম্বেই কুমারজীব উপস্থিত হলেন হো-লুস্যনের শিবিরে। সেই একই পরিবেশ, একই শিবির—যদিও সেই প্রথমদৃষ্ট শিবিরের ভৌগোলিক দূরত্ব অসংখ্য যোজন পূর্বে। সেনাপতি তাঁর শয্যায় কাতরাচ্ছেন। তিন-চারজন সেবিকা তাঁকে নানাভাবে পরিচর্যা করছে। কুমারজীব এ তিনমাসকাল লুস্যনের সম্মুখে দ্বিতীয়বার আসেননি। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বসে পড়েন রোগীর শয্যাপ্রান্তে। তাঁকে পরীক্ষা করেন। উত্তমরূপে পরীক্ষার পর বললেন, মহাসেনাপতি, এ রোগের অব্যর্থ ঔষধ আমি জানি। সে ঔষধও আছে আমার কাছে। কিন্তু…

: কিন্তু কী? ঔষধ যদি আছে তবে দিচ্ছিস্ না কেন?

: সে ঔষধ তীব্র বিষ। পরিমাণের তারতম্য হলে আপনার মৃত্যু হতে পারে।

হো-লুস্যন ভাষা খুঁজে পান না। সন্নিধাতা বলেন, ঔষধের পরিমাণমাত্রা জানেন না?

: জানি। এ ঔষধ সেবন করাতে হলে আমাকেই এখানে রাত্রিবাস করতে হবে। প্রতি অর্ধদণ্ডে একমাত্রা ঔষধ প্রযোজ্য। অন্য কোন ব্যক্তির উপর আমি নির্ভর করতে পারব না।

: তবে এখানেই তোকে থাকতে হবে সারারাত।

কুমারজীব অতঃপর তাঁর পেটিকা থেকে সেই উদ্ভিদজ ঔষধ নিয়ে এলেন। বললেন, মধু ও উষ্ট্রদুগ্ধ সহযোগে এ ঔষধ সেব্য। পৃথক পাত্রে আমাকে ঐ দুইটি

অনুপান এনে দিন।

সন্নিধাতার আদেশে শিবিরান্তরাল থেকে একজন কিঙ্করী দুই হস্তে দুইটি রৌপ্যাধারে অনুপানদ্বয় ধারণ করে শিবিরে প্রবেশ করল। তাকে দর্শনমাত্র জ্যামুক্ত ধনুকের মত দণ্ডায়মান হলেন কুমারজীব : তুমি!

দুই হস্তে দুই পাত্র ধারণ করে মৃন্ময়ী প্রতিমার মত নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে আছে কিঙ্করী। তার দুইচক্ষে দর-বিগলিত ধারা।

না। তার অঙ্গে ত্রি-চীবর নয়, রক্ত চীনাংশুক। আভরণবিমুক্তা নয় সে, সর্বাঙ্গে মণিমাণিক্যের দীপ্তি। মুণ্ডিতমস্তক নয়, এই তিন মাসে তার মস্তকে কুঞ্চিত কেশদাম স্কন্ধ স্পর্শ করছে। তার কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে শতনরী, নিতম্বে মেখলা, চরণে অলক্তকরাগ, ভ্রূমধ্যে কুমকুম চিহ্ন। বাসকশয্যা!

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন হো-লুস্‌ন, তুই চিনিস্ একে? এ হচ্ছে তোদের রাজকন্যা! ওর নাম অ-ধু-মো-তি!

কুমারজীব ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে পান। অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ, কিন্তু উনি শুধু রাজকন্যা নন, উনি আ-লী সঙ্ঘারামের মহামান্যা আগ্‌গবিনতা! এঁকে কেন ধরে এনেছেন?

: ও আমার প্রধানা রক্ষিতা!

: রক্ষিতা! দুই হস্তে আনন আবৃত করে ভূমিতলে উপবেশন করেন কুমারজীব।

এতক্ষণে প্রথম কথা বলেন অক্ষুমতী, অনুপান নিয়ে এসেছি ভেষগাচার্য।

আর্তনাদ করে ওঠেন কুমারজীব, এ আপনি কী করেছেন সেনাপতি? ও যে আমার ভগ্নী।

: ভগ্নী! ও তোর ভগ্নী? এবার উৎসাহে উঠে বসেন লুস্‌ন। বলে, এতক্ষণে সমাধান হয়েছে। শোন্ বর্বর! তোর ভগ্নী অত্যন্ত সুন্দরী। তাকে আমার মনে ধরেছিল। তাই এতদিন তাকে শুধুমাত্র আমার উপপত্নীরূপে আবদ্ধ রেখেছিলাম। সর্বজনভোগ্যা বারবনিতা করিনি। এখন···

সন্নিধাতার দিকে ফিরে বলেন, শোন আমার আদেশ। এই নারীই আমাকে ওর নির্দেশমত ঔষধ প্রয়োগ করবে। চিকিৎসক শত্রুপক্ষের বন্দী—সে বিষ-প্রয়োগে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে। তা যদি করে তবে আমার মৃত্যুর পর ঐ বন্দীর সম্মুখে এই নারীকে উলঙ্গ করে তোমরা যৌথভাবে বলাৎকার করবে। আমার বাহিনীতে এত সৈন্য আছে যে, আশা করি শুধুমাত্র ঐ পদ্ধতিতেই ওর ভগ্নীটিকে হত্যা করতে পারবে তোমরা। তারপর, সে দৃশ্য দু-চোখ মেলে

দেখার পর ঐ বৌদ্ধ ভিক্ষুটাকে তোমরা শূলে দেবে। বুঝলে?

সন্নিধাতা শিরশ্চালনে স্বীকার করে পৈশাচিক আয়োজনটার মর্মার্থ তার গ্রহণ হয়েছে।

লুম্বন এবার কুমারজীবের দিকে ফিরে বললেন, এবার দে তোর ঔষধ!
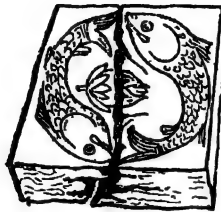
দীর্ঘদিন পরের কথা। সূর্য মকররাশিতে উপনীত হলে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী সমাপ্ত হবে। অর্থাৎ ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। সপ্তদশবর্ষ অতিক্রান্ত। মহাস্থবির কুমারজীব এখন আর শালপ্রাংশু নন, জরাক্রান্ত অষ্টসপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধ। চীনখণ্ডে আছেন দীর্ঘ ষোড়শবর্ষ কাল। রাজধানী চীন-য়াঙে নন, চীন প্রবেশদ্বারের এক অখ্যাত সঙ্ঘারামে—কাংসুতে। ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে। বৎসরাধিক কাল ধরে মধ্য-এশিয়ার গিরিসঙ্কট এবং গোবি মরুভূমির দক্ষিণ সীমান্ত উত্তরণে যখন তিনি কাংসুতে উপনীত হলেন তখন সংবাদ পাওয়া গেল বৌদ্ধ চীনা সম্রাট তাঁর রাজধানী চাং-য়াঙে আততায়ীর ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে ইতিপূর্বেই নিহত হয়েছেন। তাঁর শূন্য সিংসাসনে যিনি অধিরূঢ় হয়েছেন সেই নবীন সম্রাট বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আদৌ আগ্রহী নন। ফলে কুমারজীবের পক্ষে রাজধানীতে আগমন নিরর্থক। ততদিনে হো-লুম্বন কুমারজীবকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন। বস্তুত কুমারজীবের অদ্ভুত চিকিৎসাতেই নিরাময় হয়েছিলেন তিনি—মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসেছেন। তাই হূণ সেনাপতি ঐ বৌদ্ধ ভেষগাচার্যের কাছে উপকৃত। সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করে ভিক্ষুকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, এখন আপনি কী করতে চান? এই দুস্তর মরুভূমি অতিক্রম করা এ বয়সে আপনার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমার সঙ্গে রাজধানীতে গিয়েই বা কী করবেন?

কুমারজীব বলেছিলেন, না, রাজধানীতে যাব না। একাকী স্বদেশে প্রত্যা-প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা করলেও পথে মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা। আমি এই কাংসু সঙ্ঘারামেই অবস্থান করব।

অগত্যা তাঁকে সেই অখ্যাত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে রেখে বিপুল বাহিনী নিয়ে হো-

লুসুন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর রক্ষিতাবাহিনী সমেত।

কাংসুর এই ক্ষুদ্রায়তন সঙ্ঘারামে ভিক্ষুসংখ্যা নগণ্য। সেনাপতির ব্যবস্থাপনায় কুমারজীবের জন্য প্রচুর চীনা ধর্মগ্রন্থ সেস্থলে প্রেরিত হল। কুমারজীব ইতিমধ্যে চীনাভাষা অত্যন্ত যত্ন নিযে শিখে ফেলেছেন। তিনি একে একে পালিভাষায় লিখিত হীনযান ধর্মের গ্রন্থগুলি চীনাভাষায় অনুবাদ করতে থাকেন। অনেক চীনা পণ্ডিত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার ভিতর সর্বপ্রধান ছিলেন অর্হৎ সেং-চাও। গুরুর বাণী ও জীবনকথা তিনি বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন—অনেকটা শ্রীম লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের মতো। (বস্তুত তারই ইংরাজী অনুবাদ আমার এ গ্রন্থের অন্যতম মূল উপাদান।) কথাপ্রসঙ্গে সেং-চাও লিখছেন, 'একদিন গুরুদেবকে প্রশ্ন করলাম, আপনি ক্রমাগত অনুবাদই করে যাচ্ছেন, মৌলিক কোন গ্রন্থ রচনা করছেন না কেন?' তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'বৎস সেং-চাও! এখানে আমার মৌলিক রচনার পাঠক কোথায়? স্বদেশে থাকলে সে কার্য সার্থক হত—এখানে আমি পক্ষহীন পক্ষিশাবক—পিঞ্জরের ভিতরে বসে মহাকাশের স্বপ্ন দেখা বৃথা।'

অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনের অবকাশে মাঝে মাঝে অতীত জীবনকথা স্মরণ করতেন। সমস্ত জীবনে অসংখ্যবার তিনি মহা-মহা পণ্ডিতদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেছেন। বহু বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু কোথাও পরাজিত হননি। তাঁর মত, তাঁর নির্দেশ কেউ কোথাও কখনও খণ্ডন করতে পারেনি। চির-অপরাজেয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য তিনি।

নাঃ, ভুল হল। জীবনে একবার তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। নতমস্তকে নিজ ভ্রান্তি স্বীকার করেছিলেন। দীর্ঘ ষোড়শবর্ষ পূর্বেকার কথা। তবু স্পষ্ট মনে আছে ওঁর। তুন-হুয়ানের পথে সেই শিবিরে—যেদিন হুণ সেনাপতি হো-লুসুনের চিকিৎসা করেছিলেন তার ঠিক পরদিন।

সমস্ত রাত্রি কুমারজীব এবং অক্ষমতী চিকিৎসা ও সেবা করেছিলেন সেনা-পতির। সন্নিধাতাও উপস্থিত ছিল। মধু ও উষ্ট্রদুগ্ধের অনুপানে মিশ্রিত করে প্রতি অর্ধদণ্ডের ব্যবধানে তীব্র হলাহল পান করানো হচ্ছিল রোগীকে। অস্ত্রধারী দেহরক্ষী এবং সন্নিধাতার উপস্থিতিতে মহাস্থবির অক্ষমতীকে কোন সম্ভাষণ করেন নি। অক্ষমতীও নীরবে শুশ্রূষা করে যাচ্ছিল অভিজ্ঞ সেবিকার মত।

সেরাত্রে কুমারজীব যে অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়েছিলেন তা তুলনাহীন। অক্ষমতী তাঁর অতি প্রিয় ভগ্নী। শৈশবাবস্থা থেকেই সে তাঁর কাছে মানুষ। অক্ষমতী

অপেক্ষা তিনি বয়সে একত্রিশ বৎসরের বড়—সুতরাং সম্পর্কে ভগ্নী হলেও তিনি তাকে কন্যার মত স্নেহ করতেন। ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর হতভাগিনী আত্মঘাতিনী হওয়ার সংকল্প করে। অশ্বারোহণে সেই উদ্দেশ্যেই স্বয়ম্বর সভার পূর্বরাত্রে সে গৃহত্যাগ করে; কিন্তু পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রণাম না করে এ পৃথিবী থেকে সে বিদায় নিতে পারে না। গভীর রাত্রে সে উপস্থিত হয়েছিল কুচীসঙ্ঘারামে মহাস্থবিরের পরিবেশে। অন্তর্যামীর মতো তার উদ্দেশ্যের কথা অনুধাবন করেছিলেন কুমারজীব। সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন ভগ্নীকে। অনৃতভাষণ করতে পারেনি অক্ষমতী। তখন তিনি অক্ষমতীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন—বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'সদ্ধর্মের' কথা। মৃত্যুর কাছে নতিস্বীকার করে কোন সমাধানে পৌছানো যায় না। মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতলাভই হচ্ছে মনুষ্যত্ব। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় এ জগৎ-প্রপঞ্চ মানুষকে নানাভাবে লুব্ধ করে—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য ষড়রিপু তাকে নিরন্তর ভ্রমাত্মক পথে নিয়ে যেতে চায়। সকল অবস্থাতেই দৈহিক পীড়নকে অস্বীকার করাই ভিক্ষুর সাধনা। দেহ কিছু নয়—দেহকে অতিক্রম করে নিব্বাণের পথে আত্মার উত্তরণ। শুনিয়েছিলেন অক্ষমতীকে নামরূপ উত্তরণের সেই অপূর্ব মন্ত্রটি। অক্ষমতী স্বীকার করে নিয়েছিল। দেহের অবমাননায়, দৈহিক নিপীড়নে, দেহজ কামনা-বাসনায় সে আর কোনদিন বিচলিত হবে না এই প্রতিজ্ঞা করেছিল। সেই রাত্রেই অক্ষমতীকে উপসম্পদা দান করে-ছিলেন কুমারজীব।

রাজকন্যা অক্ষমতী হয়েছিল অগ্‌গবিনতা ভিক্ষুণী।

তাই সেরাত্রে সেনাপতির জন্য পাত্রে ঔষধ ঢালতে ঢালতে তাঁর বার বার মনে হয়েছিল—অক্ষমতীর এই মরণান্তিক ঘৃণিত জীবনের জন্য দায়ী তো তিনিই। সেদিন যদি তিনি অক্ষমতীকে আত্মঘাতিনী হতে দিতেন তাহলে এই বর্বর হূণটা তার অনাঘ্রাত যৌবনকে, তার দেবীপ্রতিমার মতো দেহকে এভাবে মরণান্তিক নির্যাতনে দলিত-মথিত করতে পারত না। ছিল কুমার ভট্টারিকা রাজনন্দিনী, হল অগ্‌গবিনতা ভিক্ষুণী, আর আজ সে এই বর্বর হূণটার পাশবিক কামনা চরিতার্থ করবার একটা জৈবিক যন্ত্র! কেমন অনায়াসে পিশাচটা বলল—'অ-খু-ম-তি' তার প্রধানা রক্ষিতা! তার উপপত্নী!

শেষরাত্রে যখন রোগী যন্ত্রণার পূর্ণ উপশমে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হল তখন মনস্থির করলেন মহাস্থবির। সন্নিধাতাকে বললেন, এবার আমি বিশ্রাম নেব। আপনি ভূর্জপত্র, মস্যাধার আর লেখনী নিয়ে আসুন। সেবিকাকে পরবর্তী নির্দেশ দিয়ে আমি শয্যাগ্রহণ করব।

সন্দেহের কোন কারণ নেই। অনুজ্ঞামতো ভূর্জপত্রাদি নিয়ে আসা হল। মহাস্থবির জানেন, এরা খরোষ্ঠী লিপি কেউ পড়তে পারবে না। অথচ অক্ষুমতী তার পাঠোদ্ধারে সমর্থা। তাই পরবর্তী শুশ্রূষার নির্দেশদানের অছিলায় কুমারজীব ভূর্জপত্রে লিখে দিলেন, "কল্যাণীয়া অক্ষুমতী, তোমার এই চরম সর্বনাশের জন্য আমিই দায়ী। আমিই সেদিন তোমাকে আত্মঘাতিনী হইতে দিই নাই। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। এই সঙ্গে যে পুরিয়া রাখিয়া গেলাম তাহা সেবন করিও। এই বর্বরের রক্ষিতা হিসাবে জীবনধারণের গ্লানি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পাইবে। আমার অন্তিম আশীর্বাদ রহিল।"

তার পরদিন সেনাপতির শিবিরে অক্ষুমতীকে দেখতে পেয়ে রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন কুমারজীব। উনি শিবিরে প্রবেশ করা মাত্র অক্ষুমতী অগ্রসর হয়ে এসেছিল। ওঁর পদপ্রান্তে নামিয়ে রেখেছিল ঔষধের পুরিয়া এবং সেই ভূর্জপত্রটি। স্তম্ভিত কুমারজীব পত্রটি গ্রহণ করে দেখেন, তার বিপরীত দিকে খরোষ্ঠী হরফে শুধু লেখা আছে :

"পরীক্ষণার্থময়ি রুদ্রমূর্তে
সমাগতাদ্ ভীতিলবোঽপি নাস্তি।
ইদং হি বক্ষঃ প্রসৃতং চিরায়
তব্বজ্রপাতং করুণেতি মন্যে॥"

গুরুকেই ফিরিয়ে দিয়েছিল গুরুর দেওয়া বীজমন্ত্র।

রুদ্রদেবের বজ্র-আশীর্বাদ বুক পেতে গ্রহণ করার মন্ত্র।

পত্রপাঠান্তে মুখ তুলে দেখেন কখন অলক্ষ্যে শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে অক্ষুমতী। আর কখনও তাকে দেখেননি।

কুমারজীবের জীবনে সেই একটিমাত্র পরাজয় কাহিনী। তাঁর কন্যাপ্রতিম ভগ্নী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল—দেহ কিছু নয়, দেহের অবমাননা অস্বীকার করে দেহাতীত সাধনায় নিব্বাণের পথে আত্মার উত্তরণই হচ্ছে মানবদেহধারী মুমুক্ষুর সাধনা।

: গুরুদেব।

তন্ময়তা ছিন্ন হয় বৃদ্ধ মহাস্থবিরের। বলেন, কী সংবাদ সেং-চাও?

: অর্হৎ কুঙ্গ নামে একজন চৈনিক শ্রমণ শাক্যসিংহের লীলাভূমি দর্শনে গমনেচ্ছু। তিনি আপনাকে প্রণাম করতে এ সঙ্ঘারামে এসেছেন। আপনার দর্শনপ্রার্থী।

: আমার সৌভাগ্য। সসম্মানে তাঁকে এখানে নিয়ে এস বৎস।

অনতিবিলম্বে সেং-চাও একজন শ্রমণ সমভিব্যাহারে মহাস্থবিরের পরিবেশে প্রবেশ করলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন মহাস্থবিরকে। কুমারজীব দুই হস্ত তুলে বললেন, আরোগ্য।

পরিব্রাজকের নাম অর্হৎ কুঙ্গ। বয়ঃক্রম আটষট্টি—কুমারজীবের অপেক্ষা প্রায় দশ বৎসরের অনুজ। শানসী প্রদেশে জন্ম। মাত্র তিন বৎসর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ভগবান তথাগতের জন্মভূমি পরিদর্শন করে ভারতের বিবিধ বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রাদির সম্যক পরিচয় লাভ ও বৌদ্ধতীর্থস্থান দর্শনমানসে তিনি ভারত ভূখণ্ডে যাত্রা করতে মনস্থ করেছেন।

মহাসমাদরে ওঁকে নিয়ে বসলেন কুমারজীব। যে পথে এসেছেন তার বর্ণনা দিলেন। পথে কোথায় কোথায় মরুদ্যান আছে, সঙ্ঘারাম আছে ইত্যাদি জ্ঞাত করলেন। বৌদ্ধতীর্থগুলির নাম, পরিচয়, গমনাগমনের সুবিধা এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলির পরিচয় দিলেন। যাত্রা শুভ হ'ক, এই কামনা জানিয়ে প্রশ্ন করলেন, কবে যাত্রা করবেন ?

: এই বৎসরই। বর্তমানে আমি রাজধানী চাং-য়াঙে যাচ্ছি। দুই মাস পরে সেই স্থান থেকে যাত্রা করব। এই পথেই যাব আমরা। সুতরাং দুই মাস পরে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে। আমার সঙ্গে আরও চারিজন ভিক্ষু যাবেন। তাঁরা বর্তমানে রাজধানীতে আছেন। বস্তুত তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতেই যাচ্ছি আমি।

: তাঁদের নাম ও পরিচয় !

: পরিচয়—তাঁরা বৌদ্ধভিক্ষু। তথাগতের জন্মভূমি দর্শনেচ্ছু। আর তাঁদের নাম ভিক্ষু পুই-চিং, হুই-হিং এবং হুই-ওয়েই।

কুমারজীব বললেন, আপনি এসেছেন, আমি এজন্য ধন্য। এখানে কিছুদিন অবস্থান করে যান।

কুঙ্গ বললেন, অমন কথা বলবেন না। বরং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমারই জন্ম সার্থক হল। আমাদের সম্রাট আপনার প্রতি যে দুর্ব্যবহার—

বাধা দিয়ে কুমারজীব বলেন, ও-কথা থাক।

কুঙ্গ বলেন, থাক। কিন্তু আমি তো চাং-য়াঙে যাচ্ছি, প্রত্যাবর্তনের সময় আপনার জন্য কোন কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসতে পারি কি ?

কিয়ৎকাল নীরব থাকেন কুমারজীব। তৎপরে বলেন, আমার একটি মাত্র বস্তুরই প্রয়োজন ছিল—ধর্মগ্রন্থ। রাজধানীতে যা কিছু পাওয়া যায় সেনাপতি হো-লুস্থন তা অনুগ্রহ করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে একটি সংবাদ যদি রাজধানী থেকে এনে দিতে পারেন কৃতার্থ হই।

: আদেশ করুন মহাভাগ।

: সেনাপতি হো-লুহুনের অবরোধে তাঁর প্রধানা উপপত্নী অ-খু-মো-তি নামের একটি হতভাগিনী নারী আজও জীবিতা আছে কিনা সম্ভব হলে এই সংবাদটি নিয়ে আসবেন। এখন তার বয়ঃক্রম ছয়চল্লিশ। যৌবনোত্তীর্ণা সে। হয়তো সেনাপতি তাকে পরিত্যাগ করেছেন। তা করে থাকলে বর্তমানে সে কোথায় আছে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন?

ভিক্ষু কুঙ বিস্মিত হয়ে বলেন, সেনাপতির উপপত্নীর প্রতি আপনার এ কৌতূহল কেন ভদন্ত? সে কি আপনার পরিচিতা?

: সে ছিল কুচীনগরীর আ—লী বিহারের অগ্‌গবিনতা। মহাধার্মিক ভিক্ষুণী। পূর্বাশ্রমে সে ছিল কুচীরাজ্যের কুমার ভট্টারিকা, রাজনন্দিনী। বস্তুত আমার ভগ্নী সে!

জ্যা-মুক্ত শার্ঙ্গের মত আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মান হন ভিক্ষু কুঙ। বলেন, ক্ষান্ত হন ভদন্ত! আমি সহ্য করতে পারছি না।

সহাস্যে কুমারজীব বলেন, সে কিন্তু সহ্য করেছিল! আপনার যদি ক্লান্তি না আসে তবে তার পূর্ণ উপাখ্যান আমি আপনাকে জ্ঞাত করতে চাই। সে পুণ্যাশ্লোকা মহাভিক্ষুণী। তার জীবনকথা আলোচনাতেও পুণ্য।

: আপনি বলুন মহাভাগ। আমি অত্যন্ত আগ্রহী।

কুমারজীব অতঃপর একেবারে শৈশবকাল থেকে অক্ষুমতীর জীবনকথা বিবৃত করলেন ভিক্ষু কুঙকে। শুধুমাত্র অক্ষুমতীর প্রেমাস্পদের নাম গোপন করলেন—কারণ মহাস্থবির বুদ্ধযশস্‌ এখনও জীবিত—কুচী সঙ্ঘারামের প্রধান তিনি। ভারত আগমনের সময় অর্হৎ কুঙ কুচীনগরী হয়েই যাবেন। অহেতুক বুদ্ধযশস্‌কে বিড়ম্বিত করা নিষ্প্রয়োজন। দীর্ঘ কাহিনী শ্রবণ করে ভিক্ষু কুঙ বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহাভাগ। এই মহীয়সী নারী সেনাপতির অবরোধেই থাকুন অথবা শহরের গণিকালয়েই থাকুন এঁকে আমি উদ্ধার করবই।

: সে যদি আমার সঙ্গে মিলিত হতে চায়, তাকে সসম্মানে নিয়ে আসবেন। সে যদি না আসতে চায় তাহলে বাকি জীবন সে যাতে ভদ্রভাবে—

বাধা দিয়ে কুঙ বলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ভদন্ত।

তিন মাস পরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সেই চৈনিক পরিব্রাজক, তাঁর চারজন সঙ্গীসহ। মহাস্থবিরের আশীর্বাদ নিয়ে তাঁরা পশ্চিমাভিমুখে পদযাত্রা করলেন। যাত্রার পূর্বে ভিক্ষু কুঙ কুমারজীবকে পুনরায় নিশ্চিন্ত করে গেলেন। সংবাদ জানিয়ে গেলেন—দুই বৎসর পূর্বেই চাং-য়াঙে চিরশান্তির দেশে মহাপ্রয়াণ করেছেন

ভিক্ষুণী অ-খু-মো-তি। তাঁর গ্লানিকর জীবনের অবসান ঘটেছে।
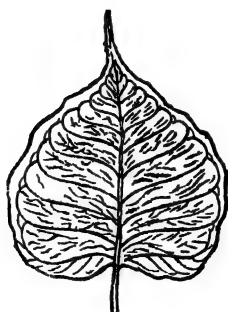
'হাংশী'-র প্রথম বৎসরে (৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে) এক শুভ প্রভাতে তাঁর উপরোক্ত চারজন সঙ্গীসহ অর্হৎ কুঙ্গ চ্যাং-য়ান থেকে সুদূর বুদ্ধভূমির দিকে যাত্রা করলেন। লংচো পর্বতমালাকে পশ্চাতে ফেলে পরিব্রাজকের দল যখন কিংকুই রাজ্যের রাজধানীতে উপনীত হলেন তখন গ্রীষ্মকালীন বর্ষাবসান। বর্ষাকালে বিহারের অভ্যন্তরে সাধনভজনের ব্যবস্থা শাক্যমুনির আমল থেকেই প্রচলিত। এসময় ভিক্ষুদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ। এদেশের রাজা তুয়ান ইয়ে তীর্থযাত্রীদের বহুল পরিমাণে সাহায্য করেন। এখানে অবস্থানকালেই এঁরা চীন থেকে আগত অপর একটি তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁরাও ভারতবর্ষ দর্শনে চলেছেন। তাঁরাও পাঁচজন। সমস্ত দলটি অতঃপর উপনীত হলেন চীনের সিংহদ্বার তুন-হুয়ান-এ। চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের দক্ষিণ প্রান্তে এই প্রখ্যাত গুহামন্দির সমন্বিত শহরটির বিস্তার পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় আশী লী এবং উত্তর-দক্ষিণে চল্লিশ লী। এখানে মাসাধিককাল অবস্থান করে অর্হৎ কুঙ্গ এবং তাঁর সঙ্গীরা পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন, দ্বিতীয় দলটি কিন্তু সেখানেই রয়ে গেলেন।

তীর্থযাত্রীদের দুর্গম পথযাত্রা শুরু হল এখান থেকেই, কারণ এবার তাঁদের যাত্রাপথ দুস্তর গোবি মরুভূমির উপর দিয়ে। পরিব্রাজক তাঁর দিনপঞ্জিকায় এই অংশে যা লিখে গেছেন তা ভ্রমণ-সাহিত্যে শাশ্বত ইতিহাস রচনা করবার দাবী রাখে। তিনি লিখেছিলেন, "আমরা প্রথমে একজন পথ-প্রদর্শকের সন্ধান করেছিলাম। পাইনি। তাতে অবশ্য কোনও ক্ষতি হয়নি। প্রথমত যে মহান সঙ্কল্প নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম তা থেকে নিবৃত্ত হবার মতো বাধা গোবি মরুভূমি উপস্থাপিত করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, এই বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে কোনও পথের চিহ্ন না থাকলেও পূর্বসূরীদের সঙ্কেত ছিল—অগণিত পথিকের ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কাল। সেই অস্থিরেখা ধরেই এগিয়ে চললাম আমরা।"

সেন-সেন, খোটান, গোমতী বিহার অতিক্রম করে অগ্নিদেশে বা কারাহুশরকে পিছনে ফেলে ভিক্ষুদল অবশেষে উপনীত হলেন কুমারজীবের জন্মভূমি কুচী-নগরীতে।

দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসরে ভস্মীভূত কুচীনগর পুনর্জীবন লাভ করেছে। পোসাং মৃত। সম্মুখযুদ্ধেই নিহত হয়েছিলেন তিনি। রাজপ্রাসাদ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছিল, পুনরায় নির্মিত হয়েছে। মহাসঙ্ঘারামও তাই। সেখানে মহাস্থবির হচ্ছেন ভিক্ষু বুদ্ধযশস্। কুমারজীবনের অনুরোধে তিনি কাশগড ত্যাগ করে এখানে এসেই অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আ-লী বিহার অবস্থিত ছিল একটি পর্বতের চূড়ায়। সেখান থেকে অল্পবয়স্ক ভিক্ষুণীদের অপহরণ ও বয়স্কাদের হত্যা করে হূণসৈন্য প্রত্যাবর্তন করেছিল। কাষ্ঠ-নির্মিত বিহারে অগ্নিসংযোগ করেনি। অর্হৎ কুঙ্গ একদিন এসে উপনীত হলেন কুমারজীবের স্মৃতিবিজড়িত সেই কুচী সঙ্ঘারাম।

চৈনিক পরিব্রাজকদের আগমন সংবাদে মহাস্থবির স্বয়ং এগিয়ে এলেন তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে। কুশল ও সৌজন্য বিনিময়ান্তে অর্হৎ কুঙ্গ বললেন, মহা-থের ! আপনার নামই তো ভিক্ষু বুদ্ধযশস্ ?

: হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে ?

: আমি আপনার জন্য একটি পত্র নিয়ে এসেছি।

অঙ্গরাখা থেকে সযত্ন-রক্ষিত একটি ভূর্জপত্র বার করে দেন চৈনিক ভিক্ষু। বুদ্ধযশস্ সবিস্ময়ে সেটি নিয়ে আদ্যন্ত পাঠ করে চমৎকৃত হয়ে যান। তাঁর গুরু মহাথের কুমারজীবের হস্তাক্ষর। তিনি লিখেছেন,

"মহাকারুণিকের পদপ্রান্তে শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন। অতঃপর হে মাননীয় ভিক্ষু বুদ্ধযশস্, মহাচীন এক উর্বর অকর্ষিত ক্ষেত্র। অগ্নিদেশ, শৈলদেশ, ভূস্বর্গ ও ভারত-ভূখণ্ডে অগণিত বৌদ্ধ ধর্মাচর্য বর্তমান, যাঁরা সদ্ধর্মের প্রচারের যথোচিত ব্যবস্থাদি করণে সক্ষম। পরন্তু চীনখণ্ডে প্রচারকের এবং প্রবক্তার একান্ত অভাব। আমি বৃদ্ধ। বিদায়গ্রহণের কাল সমাগত। কুচী সঙ্ঘারামে একদিন আমার শূন্যস্থান পূরণ করিয়াছিলেন। চীনখণ্ডে আপনি আমার শূন্যস্থান পূরণ করিয়া আমাকে ধন্য করিবেন কি ? যদি আমার শেষ ইচ্ছা পূরণে উৎসাহী হয়েন তবে নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি সমভিব্যাহারে আসিবেন।"

দীর্ঘ তালিকার উপর চক্ষু বুলিয়ে বুদ্ধযশস্ বলেন, ভিক্ষু কুঙ্গ, আপনি এ পত্রের মর্ম সম্বন্ধে অবহিত ?

: আদৌ নয়। কেন, কী আছে ওতে ?

বুদ্ধযশস্ আদ্যন্ত পত্রটি পাঠ করে শোনালেন। চৈনিক ভিক্ষু বললেন,

মহাস্থবির যথার্থ কথাই বলছেন। চীনখণ্ড আপনাকে আহ্বান করছে। সমগ্র চীনবাসীদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কেমন যেন উন্মনা হয়ে ওঠেন বুদ্ধযশস্। এ আহ্বান কেমন করে প্রত্যাখ্যান করেন? চীনে আছেন মহাস্থবির কুমারজীব—তাঁর গুরু, তাঁর পথপ্রদর্শক, তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। কে জানে, হয়তো এখনো জীবিত আছে আরও একজন হতভাগিনী!

সপ্তাহকাল চৈনিক ভিক্ষুরা অবস্থান করলেন সেই সঙ্ঘারামে। তারপর একদিন ভিক্ষু কৃষ্ণ বললেন, মাননীয় ভিক্ষু, এইস্থলে ভিক্ষুণীদিগের জন্য একটি বিহার ছিল। তার নাম আ-লী। সেটি কোথায়?

: আ-লী বিহার? আপনি তার নাম শুনলেন কোথায়?

: শুনেছি মহাস্থবির কুমারজীবের জননী ভিক্ষুণী জীবা ছিলেন এই আ-লী বিহারে অগ্‌গবিনতা। সে তো প্রতিটি বৌদ্ধভিক্ষুর তীর্থস্থান।

: ঠিকই শুনেছেন আপনি। আমি স্বয়ং আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব।

পরদিন প্রত্যুষে ওঁরা দুইজনে অশ্বারোহণে যাত্রা করলেন আ-লী পর্বতচূড়ায়। অপরাপর চৈনিক পরিব্রাজকেরা সেদিন গেলেন থ্যিজিল সঙ্ঘারাম দর্শনে। আ-লী বিহারে উপনীত হলে বর্তমান কালের অগ্‌গবিনতা ভিক্ষুণী এসে মহাস্থবির এবং চৈনিক পরিব্রাজকের চরণবন্দনা করল। পাদ্যার্ঘ্য এনে স্বয়ং ধৌত করে দিল অতিথির চরণ। সসম্ভ্রমে নিয়ে গেল প্রথমেই বিহারের কেন্দ্রস্থ চৈত্যগৃহে। চৈনিক শ্রমণ স্তূপপদমূলে প্রণাম নিবেদন করলেন। কিছুক্ষণ প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, মাননীয়া অগ্‌গবিনতা, অতঃপর আমাকে ভিক্ষুণী জীবাদেবীর পরিবেণে নিয়ে চলুন।

অগ্‌গবিনতা পথ প্রদর্শন করে মাননীয় অতিথিকে নিয়ে আসে প্রাক্তন অগ্‌গবিনতার পরিবেণে। সে কক্ষটি এখন ব্যবহৃত হয় না। ভিক্ষুণী জীবার ভিক্ষাপাত্র, যষ্টি, ত্রি-চীবর ইত্যাদি স্মৃতিচিহ্ন সেখানে সযত্নে রক্ষিত। এক পুরুষেই জীবাদেবীর উপর প্রায় দেবীত্ব আরোপ করা হয়েছে। চৈনিক শ্রমণ সেখানে প্রণাম নিবেদন করে কিছু কালাগুরু চূর্ণ প্রজ্বলিত করলেন পুণ্যশ্লোকা জীবার স্মৃতিতে। তারপর বললেন, মাননীয়া অগ্‌গবিনতা, অতঃপর আমাকে ভিক্ষুণী অক্ষমতীর পরিবেণে নিয়ে চলুন।

বুদ্ধযশস্ সবিস্ময়ে বলেন, অক্ষমতী! আপনি তাকে চিনলেন কেমন করে?

চৈনিক শ্রমণ তাঁর কথার প্রত্যুত্তর না করে অগ্‌গবিনতাকেই বলেন, আপনার পূর্বে যিনি এ বিহারে অগ্‌গবিনতা ছিলেন, তিনি কি প্রাক্তন কুচীরাজকন্যা

অক্ষমতী নন ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই। আসুন ভদন্ত। তাঁর পরিবেণটিও অব্যবহৃত। তাঁর ব্যবহৃত যষ্টি, তাঁর পরিধেয় চীবর এবং তাঁর ভিক্ষাপাত্র সেখানে সসম্মানে সংরক্ষিত। তিনি পুণ্যশ্লোকা।

চৈনিক শ্রমণ সেই পরিবেণের প্রবেশদ্বারেও কিছু কালাগুরুচূর্ণ প্রজ্বলিত করলেন।

অতঃপর বিহারের সকল ভিক্ষুণী চৈত্যগৃহে সমবেত হলেন। মহাস্থবিরের পরিচালনায় সকলে সমবেতভাবে প্রার্থনাসঙ্গীত করলেন। চৈনিক শ্রমণও যোগ দিলেন সে প্রার্থনায়।

প্রত্যাবর্তনের পথে বুদ্ধযশস্ আর কৌতূহল দমন করতে পারেন না। বলেন, ভদন্ত! এক্ষণে বলুন অক্ষমতীর নাম আপনি কোথায় শুনেছেন ?

চৈনিক পরিব্রাজক অপাঙ্গে একবার সহযাত্রী অশ্বারোহীর দিকে দৃক্‌পাত করেন। রহস্য করে বলেন, চীন দেশে নানান ভোজবিদ্যা প্রচলিত, আপনি শোনেননি ?

বুদ্ধযশস্ কাতরভাবে বলেন, তাহলে একটা কথা বলুন। সে হতভাগিনী কি আজও জীবিতা ?

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পর্শের মত একটা সম্ভাবনার কথা উদয় হল চৈনিক শ্রমণের অন্তরে। তিনি অশ্বকে গতিরুদ্ধ করেন। বলেন, বলছি। তৎপূর্বে আমার কয়েকটি প্রতিপ্রশ্নের উত্তর দিন ?

: বলুন।

: আপনি বলেছিলেন, আপনি মহা-থের কুমারজীবের নিকটেই উপসম্পদা গ্রহণ করেন। কিন্তু সেটা কি ভিক্ষুণী অক্ষমতীর সন্ন্যাসগ্রহণের ঠিক পূর্ব দিবসে।

বুদ্ধযশস্ বলেন, আপনি কি অন্তর্যামী ? হ্যাঁ, তাই বটে।

: আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—মহা-থের তাঁর জননী এবং ভিক্ষুণী অক্ষমতীকে নিয়ে কাশগড় থেকে যখন প্রত্যাবর্তন করেন, তখন কি আপনিও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ?

: আশ্চর্য ! হ্যাঁ, ছিলাম।

: পথে কি প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় ? আপনি এবং ভিক্ষুণী অক্ষমতী দলচ্যুত হয়ে কি একটি নির্জন গুহায়—

চিৎকার করে ওঠেন বুদ্ধযশস্ : বলুন আপনি কে ? আপনি ভিক্ষু কুঙ্গ নন ! আপনি অন্তর্যামী ! বলুন কী আপনার সত্য পরিচয় ?

: বলছি। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন ভদন্ত। আমার নাম কুঙ্গ

নয়। ও নামে চীনখণ্ডে কেউ আমাকে চিনবে না। যেমন 'কুমারজীব' এ নামে আপনার গুরুকেও সেখানেও কেউ চিনবে না।

বুদ্ধযশস্‌ও অশ্বের গতি সম্বরণ করেছিলেন। চৈনিক ভিক্ষুর শেষ কথাটা তাঁর কানে যায় নি। তিনি যেন সহসা আত্মস্থ হয়ে গেছেন। দূর দিগন্তে—যেখানে তুষারধবল পর্বতচূড়া ঘননীল আকাশের চালচিত্রের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন, তিনি যেন সেখানেই কোন অতীতদিনের স্মৃতির শিলালেখ সন্ধানে স্তিমিতদৃষ্টি। কেমন যেন ভাবাবিষ্ট। শান্তস্বরে বললেন, মাননীয় ভিক্ষু, আপনি যখন এত সংবাদ অবগত আছেন, তখন কি জানেন না—সেই হতভাগিনী এই আ-লী বিহার থেকে অপহৃতা হয়েছিল ?

: জানি ভদন্ত। এজন্য আপনারই মত অনুশোচনায় আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যায়।

বুদ্ধযশস্‌ ক্ষণকাল অপেক্ষা করেন। তারপর মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতেই প্রশ্ন করেন, তার সেই গ্লানিকর কদর্য জীবনের কি আজও অবসান হয়নি ?

চৈনিক পরিব্রাজক শান্তস্বরে প্রত্যুত্তর করেন, তথাগতের অসীম করুণা ! ভিক্ষুণী অক্ষমতী নির্বাণলাভ করেছেন। এ সংবাদ মহাস্থবির কুমারজীবকে জানিয়েছিলাম। আজ আপনাকেও জানালাম।

বুদ্ধযশস্‌ অবনত মস্তকে আরও কিয়ৎকাল অপেক্ষা করেন। তারপর ম্লান হেসে বললেন, তথাগতের অশেষ করুণা। চলুন এবার ফেরা যাক।

সেই রাত্রেই বুদ্ধযশস্‌ চৈনিক শ্রমণকে বললেন, 'ভদন্ত, আপনি তখন বলেছিলেন, মহাঅর্হৎ কুমারজীবকে চীনখণ্ডে 'কুমারজীব' নামে কেউ চিনবে না। একথা কেন বলেছিলেন ?

: সেখানে তাঁর নানা রূপের পরিবর্তন হয়েছে। এক্ষণে তিনি স্থবির, জরাগ্রস্ত। চীনখণ্ডে তাঁর নাম 'চিয়ু মো-লো-শিহ্‌'।[১১]

: আপনি আরও বলেছিলেন 'কুঙ্গ' আপনার নাম নয়। আপনার প্রকৃত পরিচয় কী ?

: 'কুঙ্গ' আমারই নাম। পিতৃদত্ত নাম। মাত্র তিন বৎসর বয়সে আমার দীক্ষা হয়। সন্ন্যাসজীবনে আমাকে উপাধি দান করা হয় 'সি'। চীনভাষায় 'সি' শব্দের অর্থ 'শাক্যনন্দন', সেটি তথাগতের নামান্তর। বলুন, সে নাম কি স্বীকার করা যায় ? কিন্তু সেটা উপাধি, নাম নয়। সন্ন্যাসজীবনে সঙ্ঘ আমাকে যে নামে চিহ্নিত করে দিলেন, চীনাভাষায় তার অর্থ 'বিনয়ের প্রতিমূর্তি' বা 'মূর্ত বিনয়'। বলুন ভদন্ত, দুর্বিনীতের মতো সে নামটাই বা নিজ পরিচয় হিসাবে

প্রদান করি কি করে ?

বুদ্ধযশস্ বলেন, তা হ'ক। সন্ন্যাসজীবনে আপনার যা নাম সে নামেই আপনি পরিচিত হবেন। ভারত ভূখণ্ডে প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক হিসাবে আপনার সেই অভিধাই ভারত-ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। মাননীয় ভিক্ষু, বলুন সে নামটি কী!

চৈনিক শ্রমণ সলজ্জে বলেন, সন্ন্যাসজীবনে আমার নাম : ফা-হিয়েন।

* * *

সেরাত্রে কুচী মহাসঙ্ঘারামে রাত্রের তৃতীয়যামে আশ্রমিকরা যখন গভীর নিদ্রায় সুষুপ্ত তখনও মাত্র দুইজন বৌদ্ধশ্রমণ শয্যাগ্রহণ করেননি। পাশাপাশি দুইটি পাষাণ-প্রকোষ্ঠে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে দুইজন প্রার্থনায় বসেছেন। উভয়েই চিত্তচাঞ্চল্যে উদ্বিগ্ন। অন্তরের উৎকণ্ঠা-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তথাগতের চরণমূলে নিবেদন করে শান্তির সন্ধান করছেন একান্ত-উপাসনায়। অথচ আশ্চর্য--তাঁরা যদি পরস্পরের আন্তর-বিষাদের তথ্য অবগত হতে পারতেন, তবে হয়তো নিজেরাই সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন।

নির্জন পরিবেশে অজীনাসনে সমংকায়শিরগ্রীব ভঙ্গিতে উপাসনায় বসেছেন ভিক্ষু বুদ্ধযশস্। অর্হৎ ফা-হিয়েন-এর কাছে অক্ষুমতীর শেষ সংবাদ শ্রবণ করে তিনি অপরিসীম মনোবেদনায় কাতর। অবশ্য এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারত ? অগ্‌গসেবিকা পরিনিব্বাণ লাভ করেছে, তাঁর ক্লেদাক্ত জীবনের অবসান ঘটেছে—এ তো আনন্দেরই সংবাদ। না, সেজন্য নয়, মৃত্যুর জন্য কোনও আক্ষেপ নাই—কিন্তু সেই মহিমময়ী ভিক্ষুণী যে এভাবে অবজ্ঞাত, অনাদৃত, প্রিয় পরিজন-পরিত্যক্ত ঘৃণ্য পরিবেশে এই পঠবিং (পৃথিবী) থেকে বিদায় নিলেন এই তথ্যটাই ভিক্ষুর মর্মমূলে বিদ্ধ হচ্ছিল। পরিবেণের একান্ত পাষাণগাত্রে উৎকীর্ণ বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে যুক্তকরে প্রার্থনা করছিলেন তিনি : এ সমাধান তো আমি চাইনি প্রভু। এভাবে কেন আমাকে রক্ষা করলেন !

অতীত জীবনের স্মৃতি—অক্ষুমতীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় এবং অনুরাগঘন কথোপকথন এতদিন তিনি বিস্মৃত হতেই সচেষ্ট ছিলেন। সেগুলি ছিল তাঁর সাধনার পথে অন্তরায়। কাশগড়ের চৈত্যে প্রদীপহস্তে স্তূপ পরিক্রমা, যৌথ প্রার্থনসঙ্গীত, অক্ষুমতীর উপহার এবং তাঁর প্রত্যাখ্যান, তারপর কাশগড় থেকে কুচী প্রত্যাগমনের পথে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা—প্রলয়মুহূর্তে একটি বেপথুমানা নারীদেহকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করা, নির্জন গুহায় রুদ্ধশ্বাসরমণীর বিম্বাধর উন্মুক্ত করে—না ! এসব চিন্তা অশুচি, অকল্যাণকর ! তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-

চক্রে যে অষ্টাঙ্গিক সত্যমার্গের নির্দেশ আছে তার সপ্তম নির্দেশ : সম্মাসতি! সৎ-চিন্তা বা সৎ-স্মৃতি। নির্জনগুহার সেই স্মৃতি সৎচিন্তা নয়। তাকে অন্তরের অবচেতনে নির্বাসনে পাঠাতেই হবে। তাই পাঠিয়েছিলেন এতদিন।

মহা-থের কুমারজীব যখন চৈনিক সেনাপতির কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন, তখন একটি পত্রবাহকের হস্তে তিনি কাশগড়ের সঙ্ঘারাম থেকে বুদ্ধযশস্‌কে কুচীনগরীতে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। মহা-থের বুদ্ধযস্‌কে আদেশ করে-ছিলেন কুচীসঙ্ঘারামের মহাস্থবিরের পদ অলঙ্কৃত করতে। মনে আছে, সেই পত্র-খানি হাতে নিয়ে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন বুদ্ধযশস্। কী তাঁর করণীয় বুঝে উঠতে পারেননি। কুচী সঙ্ঘারামের দায়িত্ব গ্রহণ করলে অনিবার্যভাবে গ্রহণ করতে হয় আ-লী বিহারের অগ্‌গবিনতা অক্ষমতীর দায়িত্ব। শঙ্কা ছিল সেখানেই। সম্মাবায়ামোর (সৎ যৌগিক উদ্যোগে) মাধ্যমে অন্তরের তন্‌হা (তৃষ্ণা)-কে, ছত্তিসংসতি সোতা-(ছত্রিশ প্রকারের জাগতিক কামনা-বাসনা)-কে অবদমিত করেছিলেন, আশঙ্কা ছিল অক্ষমতীর সমীপবর্তী হলে গিরিমেখলবাহন তাঁর অন্তর-রাজ্য পুনরায় দখল করতে চাইবে। অথচ দীক্ষাগুরুর আদেশও অমান্য করতে পারেননি। তাই সেদিন তিনি এমনই ভাবে তথাগতের মূর্তির সম্মুখে প্রার্থনা করেছিলেন : 'এই পরীক্ষাতে আমাকে সসম্মানে উত্তীর্ণ কর প্রভু! আমি যেন 'অনুপাদিয়ানো' (আসক্তিহীন) নিষ্ঠায় অভিঞ্‌ঞা (উচ্চতর জ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি) লাভ করি। আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে তন্‌হাকে তিরোহিত কর।' তাই করেছিলেন তথাগত। তাঁর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেছিলেন। কাশগড় থেকে কুচীনগরীতে এসে বুদ্ধযশস্ দেখতে পেয়েছিলেন—তাঁর সম্ভাব্য চিত্তচাঞ্চল্যের মূল উপকরণটি বিদূরিত। আ-লী বিহার থেকে অগ্‌গসেবিকা অক্ষমতী অপহৃতা! সারাজীবনে সেই মূর্তিমতী তন্‌হার সম্মুখে আর তাঁকে কোনদিন দণ্ডায়মান হতে হবে না। তথাগতের এই কারুণ্যে তুষ্ট হতে পারেননি বুদ্ধযশস্। সেদিনও তিনি আর্তকণ্ঠে বলেছিলেন : এ সমাধান তো আমি চাইনি প্রভু!

পাশের প্রকোষ্ঠেই প্রার্থনারত চৈনিক ভিক্ষু ঠিক তখনই আপনমনে বলছিলেন, হে লোকজ্যেষ্ঠ! হে শাক্যসিংহ! তুমি আমাকে পথের নির্দেশ দাও! তোমার প্রবর্তিত ধর্মচক্রে যে অষ্টাঙ্গিক সত্যমার্গের নির্দেশ আছে তার তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে : সম্মা-বাচা (সত্য-বাক্য)। আমি অনৃতের আশ্রয় নিয়েছি, মিথ্যার অনুসরণ করেছি। তুমি আমাকে বলে দাও : সত্য কী? জাগতিক সত্য যদি মঙ্গলময় না হয় তাহলে কোনটি বরণীয়—নিষ্ঠুর সত্য না মঙ্গলকারী অসত্য?

অন্তর-দহনে তিনিও দগ্ধ হচ্ছিলেন। মহা-থের কুমারজীবের অনুরোধে তিনি

চৈনিক সেনাপতি হো লু-স্যনের স্কন্ধাবারে স্বয়ং গিয়েছিলেন। চৈনিক অবরোধে অক্ষুমতীর সঙ্গে ফা-হিয়েনের সাক্ষাৎও ঘটেছিল। সেই অনিন্দ্যকান্তি রমণীই তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর কথা রটনা করতে। হো লু-স্যনের অবরোধ থেকে তাঁর উদ্ধারের কোনও আশা নেই। কিন্তু অহেতুক ভিক্ষু কুমারজীবকে কষ্ট দেওয়াতেই বা কী লাভ? ভগ্নীর মৃত্যুসংবাদেই তৃপ্ত হবেন তিনি, তাঁর সাধনার পথ নিষ্কণ্টক হবে। ফা-হিয়েন উপলব্ধি করেছিলেন সেই মহীয়সী মহিলার যুক্তি। সত্যই তো! কী লাভ কুমারজীবকে জানিয়ে যে, অক্ষুমতী আজও ঘৃণিত জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন সেই নরপিশাচের অবরোধে? তাই প্রত্যাবর্তনের পথে ফা-হিয়েন কুমারজীবকে জানিয়ে এসেছিলেন—অক্ষুমতীর গ্লানিকর জীবনের অবসান ঘটেছে। আজ পুনরায় একই উদ্দেশ্যে ভিক্ষু বুদ্ধযশস্‌কে সান্ত্বনা দিতে অষ্টমুখী সত্যমার্গের তৃতীয় নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন ফা-হিয়েন। 'সম্যা-বাচা' নির্দেশ সজ্ঞানে উপেক্ষা করেছেন। পার্শ্ববর্তী পরিবেশে তাই তিনিও প্রার্থনারত: হে শাক্যনন্দন, হে তথাগত! তুমি বলে দাও—আমি কি পতিত?
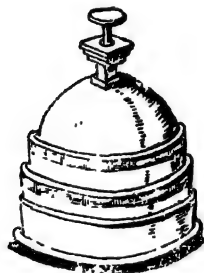
শৈলদেশ-উড্ডিয়ান-নগরহার-গান্ধার-পুরুষপুর।

ফা-হিয়েন চলেছেন গাঙ্গেয় ভারতবর্ষে—তথাগত বুদ্ধের জীবন-লীলাক্ষেত্র পরিদর্শনে। তাঁর চারজন সহযাত্রীর ভিতর দুইজন—লুইজন-ওয়েই এবং লুই-চিং পথিমধ্যে পথের ক্লেশ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। হতভাগ্য লুই-চিং পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শুধুমাত্র ভিক্ষু তাও-চিং আছেন তাঁর সঙ্গে। ফা-হিয়েন অতি শৈশবেই সদ্ধর্মে দীক্ষিত—বৌদ্ধধর্মের বাতাবরণে তিনি শিক্ষিত, শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দেখেছেন ভারতবর্ষকে। অপরপক্ষে তাও-চিং পরিণত বয়সে দীক্ষা নেন; পূর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন অধ্যাপক। ছিলেন কবি। চীনাভাষায় তাঁর গীতিকবিতা আছে। তিনি কোনও দিনপঞ্জিকা রেখেছিলেন কিনা জানা যায় না; রাখলে তা আরও আকর্ষণীয়

হত। ভারতখণ্ডে প্রবেশকালে ফা-হিয়েন আটষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ, প্রাক্তন অধ্যাপক তাও-চিং পঞ্চাশ বৎসরের ভিক্ষু। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল ধরে ভারতবর্ষ, সিংহলদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধতীর্থ দর্শনার্থে ফা-হিয়েন বিরাশী[১২] বৎসর বয়সে সমুদ্র-পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পর বৎসর ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'ফো-কিউ-কি' অর্থাৎ 'বুদ্ধভূমির বিবরণ' নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। অপরপক্ষে তাও-চিং এদেশে এসে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করে ও দেশবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে তার প্রতিফলন দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি পাটলিপুত্র পর্যন্ত ফা-হিয়েনের সঙ্গে আসেন। ফা-হিয়েন যখন পাটলিপুত্র ত্যাগ করে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন তাও চিং তাঁকে বলেছিলেন, 'ভদন্ত, আমি এ-দেশেই বাকি জীবন অতিবাহিত করব বলে স্থির করেছি।' এরপর ফা-হিয়েনের কোনও ভ্রমণসঙ্গী ছিল না। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

পুরুষপুর-নগরহিলোত্র-ভিদা মথুরা।

ফা-হিয়েনের দিনপঞ্জিকায় মথুরার নিকটবর্তী যমুনা-তীরবর্তী রাজ্যের নাম দেখছি: মধ্যরাজ্য। পরিব্রাজকের দিনপঞ্জিকা অনুসারে—"এ অঞ্চলের আব-হাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, এখানে তুষারপাত বা বালুকাঝড় হয় না। এখানকার অধিবাসীরা নিজেদের সম্পদে তৃপ্ত ও সুখী। রাজাকে এরা কোনও কর দেয় না বা সম্পত্তির কোন হিসাবও দেয় না। এ দেশের অধিবাসীরা যখন খুশী এবং যেখানে খুশী যেতে পারেন। রাজা মৃত্যুদণ্ড ব্যতিরেকেই রাজ্যশাসন করেন।...একমাত্র চণ্ডাল ব্যতীত কেহই প্রাণীহত্যা করে না, মদ্যপান করে না বা পিঁয়াজ-রশুন খায় না।...এদেশের বাজারে কোন মদের দোকান বা মাংস বিক্রয়ের দোকান নাই।"

ফা-হিয়েনের এ ভারত-বিবরণ ছাত্রাবস্থায় পাঠ করেছি, পরীক্ষার খাতায় লিখেছি। কিন্তু এ পরিণত বয়সে আশঙ্কা হয়, সরল প্রকৃতির সাধু পরিব্রাজকটি সম্ভবত তদানীন্তন ভারতবর্ষের নিচের তলার স্বরূপটা দেখতে পাননি। তিনি ক্রমাগত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে আতিথ্য নিয়েছেন—আশঙ্কা হয়, সেই সব সঙ্ঘারামের বৌদ্ধাচার্যগণ তাঁকে যে পথে পরিচালিত করেছেন তা আজকের দিনের ভাষায় 'কণ্ডাক্টেড টুর'। গুপ্তযুগের সমসাময়িক সাহিত্যপাঠে একথা বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে, বাজারে তখন শৌণ্ডিকাপণ ছিল না, মাংসের বিপণী ছিল না। বোধ করি সাহিত্যের অধ্যাপক তাও-চিং ভ্রমণকাহিনী লিখলে আরও বাস্তবচিত্র পেতাম আমরা।

মথুরা—সাংস্ক্যসেৎ (কনৌজ-এর পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে একটি গ্রাম)—অগ্নি-দগ্ধবিহার—কান্যকুব্জ—কোশল—শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তী সম্বন্ধে পরিব্রাজক লিখছেন,

"এই নগরীর প্রাক্তন-গরিমা অস্তমিত। বুদ্ধের সমসময়ে এই শ্রাবস্তীতেই ছিল কোশলরাজ প্রসেনজিৎ-এর রাজধানী। এ স্থানেই ছিল মহাপ্রজাপতি ও জেতবন বিহার এবং এই পুণ্যভূমি অর্হৎ অঙ্গুলিমাল ও অনাথপিণ্ডৎ-এর স্মৃতি বিজড়িত। এখন এখানে মাত্র দুইশত ঘর মানুষের স্তূপ ও বিহারের বাস—ধ্বংসাবশেষ সমাকীর্ণ উপেক্ষিত ক্ষুদ্র গ্রামবিশেষ।"

শ্রাবস্তী—জেতবনবিহার—তাদওয়ানগর—কপিলাবস্তু।

"কপিলাবস্তু নগরীতে অসংখ্য স্তূপ আছে, তার মধ্যে শুদ্ধোদন-প্রাসাদে মায়াদেবীর গর্ভধারণের পূর্বে শ্বেতহস্তীরূপে তথাগতের স্বপ্ন-আবির্ভাব, রাজপুত্রের নগর পরিক্রমাকালে চারিটি দৃশ্য দর্শন, ন্যগ্রোধারাম বিহারে বুদ্ধত্বলাভের পরে পিতা-পুত্রের প্রথম সাক্ষাৎস্থল....প্রভৃতি পুণ্যস্থান চিহ্নিত করে স্তূপ নির্মিত হয়েছে। কিন্তু হায়! পরমকারুণিকের জীবনস্মৃতি বিজড়িত যে কপিলাবস্তু নগরী এককালে দিবারাত্র কলমুখরিত থাকত—এখন তা মূক, বধির। নগরী জনশূন্য বললেই হয়। বিশাল প্রাক্তন-নগরীর ধ্বংসস্তূপের ভিতরে মাত্র দুই-এক ঘর পরিবার এখানে বাস করেন। আর আছেন সাধনরত কিছু বৌদ্ধভিক্ষু।"

লুম্বিনী—রামগ্রাম—বৈশালী।

লিচ্ছবী রাজগণের রাজধানী বৈশালীর উত্তর-সীমান্তে বনভূমির মধ্যে অবস্থিত আম্রবন-বিহারের বর্ণনা দিয়েছেন পরিব্রাজক। অম্বপালী বা আম্রপালী ছিলেন রাজনটী। তিনি যেন ভিক্ষুণী অক্ষুমতীর বিপ্রতীপ রূপ। অক্ষুমতী হয়েছিলেন ভিক্ষুণী থেকে বর্বর হুণ সেনাপতির উপপত্নী; আর রাজনটী আম্রপালীর উত্তরণ হয়েছিল রাজার উপপত্নীপদ থেকে অর্হৎ ভিক্ষুণীতে! এই রাজনটীর গর্ভে স্বয়ং বিম্বিসারের ঔরসে জন্মলাভ করেছিল এক জারজপুত্র—জীবক। ভেষগাচার্য হয়েছিলেন তিনি পরবর্তীকালে। জীবনের শেষ পর্যায়ে গৌতমবুদ্ধ কুশীনগর যাওয়ার পথে এই রাজ-নর্তকীর অতিথি হন। মহাপুরুষের সেই ক্ষণিক সান্নিধ্যে নটীর জীবনে এল যুগান্তর। আজীবনের সঞ্চয় দান করে তিনি শরণ নিয়েছিলেন—বুদ্ধের, ধর্মের, সঙ্ঘের।

অবশেষে মগধ রাজধানী পাটলীপুত্র।

"মধ্যরাজ্যের মধ্যে পাটলীপুত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ নগর। এখানকার লোকেরা যেমন সুখী ও সম্পদশালী সেইরূপ পরহিতব্রতী। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মঙ্গলচিন্তা করেন। বৈশ্য প্রধানেরা নগরীর বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন। সেখান থেকে বিনামূল্যে ঔষধাদি বিতরণ করা হয়। দরিদ্র অনাথ আতুরদের আহারাদি ও চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসকেরা বেশ

যত্নসহকারেই তাদের পরীক্ষা করে ঔষধপথ্যাদি প্রদান করেন এবং সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত রোগীদের চিকিৎসালয়ে রাখেন।"

পাটলীপুত্রের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে এটুকুই লিপিবদ্ধ। বাদবাকি শুধু বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য, বিহার, সঙ্ঘারাম এবং বৌদ্ধ ঐতিহ্যের বিবরণ। ফা-হিয়েন যে সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলীপুত্রে বাস করেন তখন গুপ্তসংস্কৃতির সূর্য মধ্যগগনে। অথচ কী আশ্চর্য—সে-কথার ইঙ্গিতমাত্র তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে কোথাও নেই। যে পথে তিনি ভারত পরিক্রমা করেন তার বারো আনাই ছিল গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত—সমস্ত অংশের একচ্ছত্র অধিপতি মহারাজ-চক্রবর্তী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য—অথচ তাঁর দিনলিপিতে 'গুপ্তসাম্রাজ্য' অথবা 'গুপ্তসম্রাটের' কোনও উল্লেখ নেই। সমসাময়িক অসীম প্রতিভাধর যে সব ব্যক্তি তখন মগধ রাজধানী পাটলীপুত্রে উপস্থিত ছিলেন বলে অনুমান করতে বাধে না—অমরসিংহ, ক্ষপণক, বরাহ-মিহির, কালিদাস, বেতালভট্ট, আর্যভট্ট, শূদ্রক প্রভৃতি কেউই স্থান পাননি তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। ঐসব যুগান্তকারী ব্যক্তিরা যে সমসাময়িক, তাঁরা যে সে সময় পাটলীপুত্রে উপস্থিত ছিলেন এ-কথার সন্দেহাতীত ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই; কিন্তু গুপ্তযুগের ধ্যান-ধারণা, সাহিত্য-নাটক-সঙ্গীত-নৃত্য-চিত্রশিল্প-স্থাপত্য ভাস্কর্যের বিকাশ যে পাটলীপুত্রে অতি সুস্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান ছিল এ-কথা সন্দেহ করারও কোন কারণ নেই। বৌদ্ধভিক্ষু সে সব দিকে সম্ভবত আদৌ দৃষ্টিপাত করেননি; করে থাকলেও তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে তার প্রতিফলন হয়নি।

* * *

পাঠক! এ পর্যন্ত যা বলেছি তা ফা-হিয়েনের বিষয়ে নিছক ইতিহাস। এবার অনুমতি করুন: কল্পনায় কাহিনীর জাল বুনি—

* * *

ফা-হিয়েন এবং তাও-চিং আজ মাসাধিককাল আছেন পাটলীপুত্রের মহা-সঙ্ঘারামে। কবি প্রকৃতির ভিক্ষু তাও-চিং মুগ্ধ হয়ে গেছেন এ নগরীর বর্ণাঢ্য জীবন-যাত্রায়। সর্বত্রই প্রাচুর্যের লক্ষণ। নগরবাসীরা অধিকাংশই বৌদ্ধ—শৈব উপাসকও বড় কম নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায় ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে কোনও বিরোধ আছে বলে মনে হয় না। নগরী প্রায় প্রত্যহই উৎসব-মুখরিত। সকলে সর্বসময়েই যেন উৎফুল্ল। রঙ্গ-রস নগরীর পথে-ঘাটে।

কেন্দ্রস্থলে মগধাধিপতি বিক্রমাদিত্যের গগনচুম্বী রাজপ্রাসাদ—ত্রিভূমিক; পাষাণনির্মিত। অগণিত কারুকার্যখচিত স্তম্ভ, বিচিত্রিত কক্ষ, প্রাসাদশীর্ষে মঙ্গল-কলস ও তদুপরি ধ্বজা। দুর্গের আকারে সুউচ্চ প্রাচীরে রাজপ্রাসাদ সুরক্ষিত।

প্রাকারশীর্ষে সারি সারি ইন্দ্রকোষ—সেখানে অতন্দ্রপ্রহরায় ধাম্বকী। ঐ প্রাচীরের বহির্দিকে প্রশস্ত পরিখা। একটি মাত্র সিংহদ্বার। যার ভিতর দিয়ে হাওদা-সহ রাজহস্তী অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। সিংহদ্বারের সম্মুখে কাষ্ঠনির্মিত একটি সেতু—কপিকলের সাহায্যে তা উঠানো-নামানো যায়। রাতের প্রথম প্রহরে কালসূচিকা যবনী প্রহরিণী ধাতব ঘণ্টাধ্বনির সঙ্কেত করলে সেই কাষ্ঠনির্মিত সেতু অপসারিত হয়, ব্রাহ্মমুহূর্তে বৈতালিকদল রামকেলীতে মাঙ্গলিকী শুরু করলে সেতু যথাস্থানে অবনমিত হয়। সিংহদ্বারের সরাসরি রাজপথ উন্মুক্ত প্রান্তর ভেদ করে এসে পড়েছে এক মীনার-শোভিত উদ্যানে। মীনার বস্তুত একটি প্রকাণ্ড সূর্যঘড়ি—আর্যভট্টের নির্দেশে নির্মিত। তার ছায়াপাত নগরবাসীকে দিবাভাগে সময় নির্দেশ করে। ঐ মীনারকে কেন্দ্র করে একটি চতুর্মহাপথ। তার ধারে ধারে অধিকরণসমূহ—মহাক্ষ-পটলিকের অধিকরণ, সুরাধ্যক্ষ্যের অধিকরণ, শুল্কাধ্যক্ষ, আরক্ষাপতি প্রভৃতির অধিকরণ। চতুর্মহাপথের একটি বাহু পণ্যকেন্দ্রের দিকে প্রসারিত। সেখানে পথপার্শ্বে অজস্র পণ্যবিপণী—চতুরস্র নাট্যগৃহ, পুষ্পবিপণী, শৌণ্ডিকাপণ। শেষোক্ত স্থানটি মদ্যপদিগের বেলেল্লাপনার স্থান নয়, তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মাল্য-চন্দন-সৌগন্ধ্যির আয়োজন। একক পানের ব্যবস্থা। কোথাও বা দীর্ঘায়তন কক্ষে যৌথপানের আয়োজন। সেখানে দিবসান্তে সমবেত হন বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ—শ্রেষ্ঠী, সওদাগর, রাজপুরুষেরা। আসেন শিল্পী, ভাস্কর, কবি, নাট্যকার। অক্ষবাটের পাসিটর পার্শ্বপরিবর্তনে সেখানে শ্রেষ্ঠ ও অকিঞ্চনের অকিঞ্চন ভাগ্য বিনিময় করে। তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী এবং ভৃঙ্গারবাহিনী সুস্তনুকা-পরিচারিকার দল বিলোল কটাক্ষের অনুপানসহ সরবরাহ করে চলে শূল্যপক্ব মেষ-মাংস এবং নানান জাতের মদিরা—গৌড়ী, পৈষ্ঠী, মাধ্বক, আম্রশীধু, প্রসন্না, আসব, অরিষ্ঠ, মধু শ্বেতসুরা, বারুণী, সোমরসিকা। ইদানীংকালের আসব-প্রেমিক 'আধারকার' যেমন এক এক পরিবেশে এক-এক পানীয়ের বিধান দেন, গুপ্তযুগের মদিরা-বিশেষজ্ঞও তেমনি এক-এক ঋতুতে এক-এক মধু-আস্বাদনের বিধান দিতেন: গৌড়ী তু শিশিরে পেয়া পৈষ্ঠী হেমন্তবর্ষয়ে / শরৎগ্রীষ্মবসন্তেষু মাধ্বী গ্রাহ্যা চ নান্যথা:

পাটলীপুত্রের এই আনন্দঘন আয়োজন সম্বন্ধে অবশ্য ভিক্ষু তাও-চিং কোন প্রত্যক্ষজ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেননি—তিনি আজন্ম সংযমী। প্রব্রজ্যা-গ্রহণকালে ত্রিশরণ অবলম্বন মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "সুরা-মেরেয়-মেজ্জ পমাদঠানো বেরমনী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি"—"সুরা-মেরেয়-মত্তাদি প্রমাদ কারণ হতে আজন্ম বিরতির ব্রত গ্রহণ করিলাম"; ফলে তিনি মদ্যপান করেন না। এ বিষয়ে তাঁর

জ্ঞান শ্রুতি-নির্ভর। এই মহাসঙ্ঘারামের তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র এ বিষয়ে তাঁকে পরোক্ষজ্ঞান সরবরাহ করেছিল মাত্র। বুদ্ধভদ্র সম্প্রতি উপসম্পদা নিয়েছে, এ সঙ্ঘারামেরই আবাসিক। বয়ঃক্রম দ্বাবিংশবর্ষ। তার জন্ম এক ধনবান শাক্যবংশে, বস্তুত স্বয়ং গৌতমবুদ্ধের বংশেই তার জন্ম। কৈশোরে এবং তারুণ্যের প্রথম পর্যায়ে পাটলীপুত্র আসবাগারে তার যাতায়াত ছিল।

শুধু আসব নয়, এ মহানগরীর যোষিতেরাও অতি বিচিত্রা। শেন্‌সি, হোনান, চাং-য়ান—বস্তুত সমগ্র হান-সাম্রাজ্যে তাও-চিং যে রমণীদিগকে দেখেছেন তাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য প্রচুর—আকৃতি ও প্রকৃতিতে। এরা কৃত্রিম কাষ্ঠপাদুকায় চরণদ্বয়ের বৃদ্ধিনাশে আদৌ উৎসাহী নয়, বরং রক্তবর্ণের আলিম্পনে বিচিত্রিত করে যুগলচরণ, তার উপরে পরিধান করে সপ্তস্বরনিঃস্বনমধুর আভরণ—তার নাম নূপুর। অভিসার-রাত্রিতে আবার নাকি খুলে রাখে সে আভরণ। এদের আননে লোধ্রেণুর মৃদুপ্রলেপ, নয়নে কজ্জল, অধরোষ্ঠে মধু-মোম-কুঙ্কুম ইঙ্গুদীতৈলের বর্ণিকাভঙ্গ, কর্ণে শিরিষ, চূড়াপাশে কুরুবকগুচ্ছ, নিতম্বে রত্নখচিত মেখলা। হান-রমণীর ন্যায় এদের গণ্ডদ্বয় চেরীপুষ্পের মতো রক্তাভ নয়, অনিন্দ্য-আননে আষাঢ়-সঘন বুদ্ধভূমি-সুলভ শ্যামলিমার। হান-কুমারীর মত এরা নিত্যলাজনম্রনয়না নয়—ভ্রূবিলাসভিজ্ঞা নাগরিকার দল ক্ষণে ক্ষণেই কলহংসনিঃস্বনমুখরা, এরা মদালসা, নিপুণিকা, চতুরিকা, কৌতুকপরায়ণা রসিকার দল।

না, মাধ্বীর ন্যায় পাটলীপুত্রী মধুমিতাগণের বিষয়েও আজন্ম-ব্রহ্মচারী ভিক্ষু তাও-চিং কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেননি; প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে এ বিষয়েও তাঁর প্রতিজ্ঞা করা আছে—"নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদস্সনা বেরমনী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি, অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি"—অর্থাৎ "নৃত্য-গীত-বাদ্য এবং কৌতুকাদিদর্শন হতে বিরতি, অব্রহ্মচর্য হতে বিরতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম"—ফলে এ বিষয়েও তাঁর অভিজ্ঞতা পরোক্ষ, শ্রুতি-নির্ভর। তরুণ-বয়স্ক ভিক্ষু বুদ্ধভদ্রের সদ্যত্যক্ত সংসারাশ্রমের স্মৃতিকথা।

কিন্তু তৃতীয় একটি বিষয়ে কবি তাও-চিং গুপ্তযুগের মধু রসাস্বাদন প্রত্যক্ষভাবে করেছেন। সাহিত্য-কাব্য-নাটক। ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র তাঁকে সরবরাহ করত সদ্যলিখিত কাব্যের অনুলিপি। সে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর—চীনা কাব্য-সাহিত্য অপেক্ষা গুপ্তযুগের সংস্কৃত কাব্য সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। কৌতুক বোধ করতেন ভিক্ষু তাও-চিং। তিনি তর্ক করতেন ঐ ভারত ঐতিহ্যাভিমানী তরুণের সঙ্গে। বলতেন, না, গুপ্তকবিরা যে মন্দ লেখেন একথা বলা চলে না, তবে চৈনিক কবিকুলের সমকক্ষ হওয়ার এখনও অনেক বাকি।

ক্ষুব্ধ হত বুদ্ধভদ্র। মর্মাহত হত। সবিনয়ে বলত, হয়তো তার হেতু সংস্কৃত ভাষাটা আপনার ঠিকমত আয়ত্ত হয়নি, তাই—

: সে কথা অস্বীকার করি না; তবু তুলনামূলক বিচারে বলব, ভাষার অতিরিক্ত ভাবের রাজ্যেও চৈনিক কাব্যের মাধুর্য অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী। ধর না কেন, যে কাব্যগ্রন্থটি তুমি আমাকে পড়তে দিয়েছিলে—ঐ বিবাহিত গোপবালার সঙ্গে বংশীবাদক গোপালকের অবৈধ প্রেম-কাহিনী। এই বিষয় নিয়ে দ্বিশতাধিকবর্ষ পূর্বে অনেক চৈনিক কবি লিখেছিলেন: "গোপালক ও তন্তুবায় কুমারীর কাব্য"; তফাৎ এই যে, চীনা নায়কও রাখাল বটে, কিন্তু চীনা-নায়িকা তন্তুবায় পরিবারের কুমারী-কন্যা। সেখানেও নায়িকা ঐ রাখাল নায়কের বংশীধ্বনি শুনে ঘর ছেড়ে পথে নামতেন। আরও প্রভেদ আছে; চীনা প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের পথে মূল বাধাটা শাশুড়ী-ননদিনী বা সমাজ নয়; সামন্ত-তন্ত্রের অত্যাচার—পূরবীয়া হান-যুগের সামাজিক অবস্থাটা সেখানে অনেক ভাল ভাবে ফুটেছে—

বুদ্ধভদ্র বলে, প্রেম যেখানে উপজীব্য সেখানে সামাজিক সমস্যা প্রতিফলিত হল কি হল না সেটা গৌণ। এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় বিরহের যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা অনবদ্য। এমন কিছু কি চীনা সাহিত্যে আছে?

: আছে। কবি চিন-চিয়ার কথা বলি। রাজাদেশে কবিকে দূরদেশে যেতে হল। সেখান থেকে প্রেয়সীকে লেখা তাঁর চিঠিখানিতে বিরহের যে চিত্র পাই তা অকৃত্রিম। কবি বিদেশ থেকে লিখছেন—

"পুরুষ মানুষের সৌভাগ্য—যেন ভোর বেলাকার শিশির,
দুর্ভাগ্য তার নিত্যসঙ্গী, বিরহবেদনা তার নিত্যসহচর।
মিলন-মধুর মুহূর্ত? সে তো সুদুর্লভ প্রাপ্তি।
আদেশ পেলেম—রাজাদেশে যেতে হবে ভিন্‌দেশে;
দূরে আরও দূরে, তোমার সঙ্গে ব্যবধান দীর্ঘায়ত করে।
পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমার রথ
যাবার আগে একবার তোমাকে দেখব বলে।
গেল শূন্যগর্ভ, ফিরেও এল রিক্ত-শকট।
রিক্ত নয়, এল তোমার অন্তর-নিঙরানো আর্তি।
আহারে আজ রুচি নাই,
একা পড়ে আছি শূন্য মন্দিরে।
ত্রিযামা যামিনী যায় বিনিদ্র যন্ত্রণায়;
উপাধানটা নিষ্পেষিত, বিপর্যস্ত।

বেদনা যেন বৃত্তাকার : তার চক্রবর্তন অন্তহীন।
মাদুরের মত তাকে গুটিয়ে শেষ করা যায় না।"

সহজ সরল বক্তব্য। শেষ কয়টি পংক্তিতে কবি লিখছেন :

"পড়ে আছে মাথার কাঁটাগুলি,
যারা একদিন মুখ লুকাতো তোমার খোঁপায়।
পড়ে আছে অনাদৃত দর্পণ,
যা একদিন ছবি আঁকত একটি অনিন্দ্য আননের।
অমূল্য সম্পদ এরা নয়,
তবু এরা নয় অকিঞ্চন।
এদের মধ্যেই আছে তোমার স্মৃতি
আর আমার আকিঞ্চন।"[১৩]

বুদ্ধভদ্র স্বীকার করতে বাধ্য হয়—এ গীতিকবিতাও অনবদ্য।

তাও-চিং বলেন, তফাৎ আরও আছে। আমাদের কবিপ্রিয়াও ছিলেন স্বয়ং কবি। প্রোষিতভর্তৃকা কবি-প্রিয়া এ পত্রের যে ছন্দোবদ্ধ প্রত্যুত্তর পাঠিয়েছিলেন তার সঙ্গে তুলনা করতে পারি—না, বুদ্ধভদ্র, তেমন কোন কবিতাও আমি সংস্কৃত সাহিত্যে পাইনি :

"তোমার মুখখানা মনে পড়ছে ক্রমাগত
জাগরণে-নিদ্রায়-স্বপ্নে।
বারম্বার মনে পড়ছে : তুমি চলে গেছ!
সে বুঝি কোন যুগ যুগান্তর অতীতের কথা।
যদি ডানা থাকত এক জোড়া
মেঘের মতন ভেসে যেতাম তোমার কাছে।
এখন শুধু দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজলেই আমার সান্ত্বনা।[১৪]

লক্ষ্য করে দেখ বুদ্ধভদ্র—কোথাও অতিশয়োক্তি নেই। কালো তমালবৃক্ষ দেখে উদ্বন্ধনে অথবা কালো যমুনার জল দেখে জলমগ্ন হয়ে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ নেই। সহজ-সরল বক্তব্য।

বুদ্ধভদ্র বলে, আশ্চর্য! মেঘের মতন?

: হ্যাঁ, মেঘের মতন। এতে অবাক হওয়ার কী আছে!

বুদ্ধভদ্র বলে, ভদন্ত, ঐ 'মেঘের মতন' শুনে আমার আর একটি সম্প্রতি-লিখিত কাব্যের কথা মনে পড়ল। আপনি সেটি বরং পড়ে দেখুন—

উৎসাহী তরুণ অতঃপর তাঁকে এনে দিয়েছিল একটি সাম্প্রতিক কাব্য।

উজ্জয়িনীর এক উদীয়মান কবির সদ্যসমাপ্ত কাব্য। জনৈক শাপগ্রস্ত যক্ষ তার প্রেয়সীর নিকট মেঘকে দূত হিসাবে প্রেরণ করছে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপকটি। এ কী অপূর্ব কাব্য! শব্দ প্রয়োগের কী বিচিত্র মুন্সিয়ানা, মন্দাক্রান্তা ছন্দের কী জলদগম্ভীর ব্যবহার, অক্ষরে-গাঁথা, কী অক্ষয় চিত্র! স্থানে স্থানে অবশ্য অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে অর্থগ্রহণ ব্যাহত হচ্ছিল; তবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভিক্ষু তাও-চিং। কবির মেঘ যে পথে যাত্রা করেছে উজান পথে তিনি যে সেই সব দেশ দেখতে দেখতেই এসেছেন। মানসসরোবরই নয়, তারও উত্তরে অবস্থিত ইশ্‌কৃ-কৃল হ্রদে তিনি যে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন স্বচ্ছশীতল জলে গণনাতীত প্রস্ফুটিত পদ্ম, আর সেই বনে সপাষদ গজ-রাজের জলকেলী—"হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ কুর্বন্ কাম ক্ষণমুখ-পট-প্রীতিমৈরাবতস্য।" কে এই অখ্যাতনামা কবি? উজ্জয়িনীর ভট্ট কালিদাস? বুদ্ধভদ্র বলেছে—মাত্র সপ্তবিংশতি বৎসরের এই ব্রাহ্মণ কবি উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ রত্ন। নাকি রাজচক্রবর্তী বিক্রমাদিত্যের সভায় এই পাটলীপুত্রেই অবস্থান করছেন। ভিক্ষু তাও-চিং ভিন্ন পথের পথিক; তবু তিনি নিজেও যে এক সময়ে চীনা ভাষায় গীতিকবিতা রচনা করেছেন। স্থির করেন, পাটলীপুত্র, ত্যাগ করে যাওয়ার পূর্বে ঐ উদীয়মান কবির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। কিন্তু সে কথা স্বীকার করলে বুদ্ধভদ্রের নিকট পরাজয় বরণ করতে হয়। কৌতুকপ্রিয় ভিক্ষু তাই এক তির্যকপন্থা অবলম্বন করলেন।

দিন কতক পরে বুদ্ধভদ্র যখন এসে প্রশ্ন করে, 'মেঘদূতম্ আপনার কেমন লাগল?' তখন তাও-চিং কোন উৎসাহ না দেখিয়ে সংক্ষেপে শুধু বললেন, মন্দ নয়। তবে কাব্যের মুখবন্ধে কবি যদি চৈনিক কবিদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেন তাহলেই শোভন হত।

বুদ্ধভদ্র বলে, কী বলছেন আপনি ভদন্ত! তার অর্থ?

: এ তো কোন মৌলিক কাব্য নয়। মেঘকে দূত হিসাবে কল্পনা করার যে ব্যঞ্জনা সেটি তো কবি স্পষ্টতই চীনা সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছেন—

: ঐ চিন-চিয়ার একটি পংক্তির উল্লেখ থেকে?

: না। অসংখ্যবার ঐ প্রতীকটি চীনা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

: কিন্তু কবি কালিদাস চীনা কাব্য কোথায় পাবেন?

: সম্ভবত কোনও পর্যটক অথবা সার্থবাহের কাছে।

: কিন্তু তিনি ঐ চীনাকাব্য পাঠ করবেন কি করে?

: সে-কথা কবিই বলতে পারেন। আমি নই।

অনেকক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করে বুদ্ধভদ্র। সে স্পষ্টতই মর্মাহত। তারপর বলে, ভদন্ত, সাহিত্যে আমার অধিকার সামান্যই; কিন্তু এতবড় অভিযোগ যখন আপনি এনেছেন, তখন এ প্রতর্কের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। আমি কল্য সন্ধ্যায় একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে নিয়ে আসব। আপনি তাঁকে প্রমাণ দিন 'মেঘদূতম্' মৌলিক কাব্য নয়।

কৌতুকপ্রিয় তাও-চিং বলেন, বিতর্কের কী প্রয়োজন বুদ্ধভদ্র! তোমাদের কবি তো শুনেছি বর্তমানে পাটলীপুত্রেই অবস্থান করছেন। তাঁকেই বরং জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, সর্বসমক্ষে নয়—

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বুদ্ধভদ্র বলে, তাঁকে তো বলবই। হ্যাঁ, আমি তাঁর ভক্ত এবং তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপও আছে। সে যা হোক, কাল সন্ধ্যায় আমি আসব।

পরদিন সন্ধ্যায় ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র একজন তরুণ ব্রাহ্মণকে নিয়ে এলেন বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে। অপরাহ্নকাল। ভিক্ষু তাও-চিং সঙ্ঘারামের প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানের একান্তে একটি সপ্তপর্ণী বৃক্ষচ্ছায়ায় কী একটা গ্রন্থ পাঠ করছিলেন। আগন্তুককে নিয়ে বুদ্ধভদ্র তাঁর নিকটস্থ হতেই তিনি চোখ তুলে চাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

আগন্তুক ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম আনুমানিক ত্রিংশতিবর্ষ। গাত্রবর্ণ চম্পকগৌর নয়, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের আকাশের মত—দীর্ঘ সন্নত শ্যামকান্তি যুবাপুরুষ। ঋজু শালবৃক্ষের মত সতেজ। প্রশস্ত ললাট, শুকচঞ্চু নাসা, কম্বুগ্রীব। ঊর্ধ্বাঙ্গে চীনাংশুক উত্তরীয় এবং শ্রীফলরস-সম্মার্জিত শুভ্র উপবীত। কণ্ঠে একটি যূথিমাল্য। মস্তক মুণ্ডিত, পশ্চাদ্ভাগে অর্কশিখায় একটি রক্তকরবী অনুবিদ্ধ। ভ্রূমধ্যে শ্বেত-চন্দনের মাঙ্গলিকী। সর্বাবয়বে প্রতিভার স্বাক্ষর। তাও-চিং দর্শনমাত্র অনুভব করেন—আগন্তুক নিঃসন্দেহে কবি কালিদাস স্বয়ং।

বয়ঃজ্যেষ্ঠ বৌদ্ধশ্রমণের সম্মুখে বদ্ধাঞ্জলিপুটে প্রণতি জানিয়ে আগন্তুক দণ্ডায়মান হলেন।

তাও-চিং আসন ত্যাগ করে দুই হস্ত উত্তোলন করে বললেন, আরোগ্য।

বুদ্ধভদ্রের দিকে ফিরে বললেন, অতিথির জন্য একটি মৃগচর্মাসন নিয়ে এস বৎস।

আগন্তুক বলেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না ভদন্ত। এ আশ্রমের পবিত্র ধূলিস্পর্শ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। তাছাড়া স্বয়ং যুধিষ্ঠির বলেছেন, ভূমিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আসন।

উভয়েই উপবেশন করেন। আগন্তুক বলেন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি ধন্য। ইতিপূর্বে চীন দেশের কোন মানুষ আমি দেখিনি। আপনি তো সুন্দর সংস্কৃত বলেন।

তাও-চিং বলেন, মহাশয়ের পরিচয়?

: উল্লেখযোগ্য কিছুই নই। আমি একজন ভারতীয় দীন কবি। ব্রাহ্মণ। উজ্জয়িনীর কবি ভট্ট কালিদাস আমার অভিন্নহৃদয়। ভিক্ষু বুদ্ধভদ্রও তাঁর গুণগ্রাহী। তাঁর কাছে শুনলাম, আপনি কালিদাসের একটি কাব্যগ্রন্থ সম্প্রতি পাঠ করেছেন—'মেঘদূতম্'। আপনার মূল্যায়ন সম্বন্ধে অবহিত হলে কবিকে জ্ঞাপন করতে পারি।

'অভিন্নহৃদয়' স্বীকারোক্তি থেকেই তাও-চিং নিঃসন্দেহ হলেন—আগন্তুক স্বয়ং কালিদাস। বললেন, আমার মতামত তো ইতিপূর্বেই ভিক্ষু বুদ্ধভদ্রকে জ্ঞাপন করেছি। সে কিছু বলেনি?

: বলেছে। আপনি নাকি এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, কালিদাস কোনও চীনাকাব্য অনুকরণে এ কাব্যটি রচনা করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের দুরন্ত কৌতুহল। চীনা কাব্যেও কি বিরহী নায়ক মেঘকে দূত হিসাবে প্রেরণ করেছিল?

: পরিকল্পনাটা একই রকম, যদিচ তার বিস্তারটা বিভিন্ন। বারিদকে দূত হিসাবে প্রেরণ করার যে চিত্রকল্প সেটি একাধিক চীনা কবিতায় আছে। প্রথম উদাহরণ চু-য়াং-এর একটি ছোট্ট গীতি-কবিতা। 'বিরহ' তার নাম। কবি বলছেন:

"নির্জনে বসি বিরহবিধুর সুরে
গাহি গান, চাহি অসীম দূর আকাশে,
কোথা পাব দূত গৃহ হতে অতি দূরে
কেমন পাঠাব বার্তা প্রিয়ার পাশে?
... ...
"পুষ্করমেঘে বৃথা তোষামোদ করি
যাচ্ঞা আমার মোঘা হে নিঠুর মেঘ!
দূর হতে ঐ বিহগে যখন স্মরি
হেসে ভেসে যায় ওরা বিদ্যুৎবেগে।"[১৫]

আগন্তুক সবিস্ময়ে বলেন, আশ্চর্য! জড়বস্তু মেঘকে প্রাণবন্ত বলে কল্পনা করে কোন চৈনিক কবি যে তাকে দূত হিসাবে প্রেরণের কথা ভেবেছেন তা তো আমার জানা ছিল না।

তাও-চিং পরিস্থিতিটা উপভোগ করছেন। কৌতুকপ্রিয় চীনা কবি হাস্য গোপন করে বলেন, আপনার হয়তো জানা ছিল না। আমার ধারণা আপনার অভিন্নহৃদয় বয়স্যের হয়তো ছিল। অবশ্য 'অভিন্নহৃদয়' শব্দটা হয়তো এক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত হচ্ছে না। তারপর দেখুন, চু-য়াং-এর পরবর্তী যুগের বিখ্যাত কবি লি-সাও একটি দীর্ঘায়ত গীতি কবিতায় একই চিত্রকল্প ব্যবহার করছেন। এবারে কবি বলেছেন :

> "পূর্বাচলে গিয়েছিলেম মরকতের পুরে
> হরিৎ-শোভায় খুঁজেছিলেম প্রিয়ার কণ্ঠহার,
> বলেছিলেম, 'ঝরাপাতার দিনের আগেই তোরা
> অনিন্দ্য সে তন্বী-তনু সাজিয়ে তুলিস্ তার।'
> মেঘরাজে বলি, 'খুঁজে দেখুন গগনপথে
> মন্দাকিনীর কোন্ বাঁকেতে অপ্সরী মোর আছে।'
> পান্নাগাঁথা কোমরবন্ধ দিয়েছিলেম খুলে
> দৌত্যকাজে অস্বীকৃত হয় যদি সে পাছে।
> খেয়ালখুশির পাগলামি যার নাইক অবশেষ—
> সাঁঝের বেলা ঘুমিয়ে পড়ে কোন্ পাহাড়ের কোলে
> ভোরবেলা ফের ঝরণাধারে ঝাড়ে চিকুর কেশ॥"[১৬]

বিস্ময়-বিমূঢ় আগন্তুক আপনার অজ্ঞাতসারেই আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মান হন। বলেন, বিশ্বাস করুন, মহাভাগ! 'মেঘদূতম্' রচনার পূর্বে এসকল কাব্য আমি পাঠ করিনি।

তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হন বৃদ্ধ তাও-চিং। কবিকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠেন, বিশ্বাস করেছি, কবি। কারণ এতক্ষণে যে তুমি ধরা দিয়েছ ভাই! আমি সন্ন্যাসী, ভিন্ন পথের পথিক, তবু তোমার কাব্য-পাঠে আমি এতটা অভিভূত যে এই 'বক্রঃপন্থায়' তোমাকে উদ্ধার করলাম।

কবি নিরতিশয় লজ্জিত। উত্তেজনা-মুহূর্তে তিনি আত্মপরিচয় ঘোষণা করে বসে আছেন!

তাও-চিং বলেন—মেঘকে তুমি বলেছিলে 'বক্রঃপন্থায়' উজ্জয়িনী সন্দর্শন করে যেতে, নাহলে তার নয়নই নাকি বৃথা। পড়ে মনে হল সেই উজ্জয়িনীর

বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত লোলাপাঙ্গ পৌরাঙ্গনাগণ যাঁকে কবীন্দ্র আখ্যায় ভূষিত করেছেন, বুদ্ধভূমিতে এসেও যদি তাঁকে দেখে না যাই তবে আমিও 'লোচনৈর্বঞ্চিতোঽস্মি' !

কবি অত্যন্ত কুন্ঠিত হয়ে বলেন, মহাভাগ ! এমন করে বলবেন না।

: নিশ্চয় বলব। আমিই তো বলব। এতাবৎকাল তুমি স্বদেশবাসীর ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছ ; কিন্তু কবি ! এ তো শুধু ভারতবর্ষের নয়, এ কাব্য যে বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ। তাই বিদেশবাসী হিসাবে আমি যদি তোমাকে অভিনন্দন না করি তবে আমার জীবনই মোঘা !

কবি যুক্তকরে নিমীলিত নেত্রে সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

তাও-চিং বলেন, কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। একই চিত্রকল্প ভিন্ন কালে ভিন্ন দেশে দুই ভিন্ন কবিকে অনুপ্রাণিত করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি কৌতুক করছিলাম মাত্র।[১৭]

মেঘদূত-কবির মনের মেঘ এতক্ষণে সরে যায়।

অস্তসূর্যের দিকে তাকিয়ে ভিক্ষু বলেন, প্রার্থনার সময় সমাগত। তুমিও আসবে আমাদের প্রার্থনা সভায় ?

কালিদাস বলেন, নিশ্চয়ই। আপনাদের সঙ্গে একত্রে মহামানব তথাগতকে প্রণাম করা তো সৌভাগ্য।

তিনজনে অতঃপর সঙ্ঘারামের কেন্দ্রস্থ চৈত্যমন্দিরে উপস্থিত হলেন। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ভিক্ষু প্রার্থনা-সভায় ইতিমধ্যেই সমাগত হয়েছেন। মন্দিরটি প্রায় পঞ্চাশ হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ। প্রস্থে বিশ হাত। দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভের কেন্দ্রস্থ প্রার্থনাস্থল ভক্তে পরিপূর্ণ। সকলেই মুণ্ডিত মস্তক, সকলেরই পীতবসন। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগ বৃত্তাকার ; সেই বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে স্তূপটি নির্মিত—তার চারিদিকে প্রদক্ষিণ পথ। স্তূপমধ্যে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানীবুদ্ধ—গুপ্তযুগের অনবদ্য ভাস্কর্য। বুদ্ধমূর্তির উপরে অণ্ড, তদুপরি ছত্রাবলীর সপ্তপর্ণী ও ত্রিরত্ন। স্তূপের দুই প্রান্তে দুটি একাদশমুখী দীপাধার। উজ্জ্বল আলোয় চৈত্যস্তূপ আলোকিত। ধূপের গন্ধে চৈত্যমন্দির আমোদিত। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন প্রার্থনাসভা পরিচালনা করছেন। আগন্তুক তিনজন ভক্তসমাবেশের একান্তে আসন গ্রহণ করেন।

মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হল। শ্রমণেরা সমবেতভাবে প্রণাম করলেন। পূজান্তে অন্যান্য ভিক্ষুরা নিজ নিজ পরিবেণে প্রত্যাগমন করলেন। চৈত্যমন্দির জনশূন্য হয়ে এলে তাও-চিং কবিকে নিয়ে এলেন ফা-হিয়েনের সন্নিকটে। পরিচয় করিয়ে

দিলেন উভয়ের। কালিদাস প্রণাম করলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে। পরিব্রাজক বললেন, আপনার নাম শুনেছি। প্রীত হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিতি হয়ে। তবে আমি ভিন্ন পথের পথিক। কাব্য পাঠ করি না। তা হোক, আমার সঙ্গী তাও-চিং কাব্যসাহিত্যের একজন বোদ্ধা।

কথা বলতে বলতে ওঁরা মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এসে উপনীত হলেন। ততক্ষণে শুক্লপক্ষের চন্দ্রালোকে শান্ত আশ্রম-উদ্যান এক রূপালী উত্তরীয়ে আবৃত। মৃদুমন্দসমীরে উদ্যান-পুষ্পের সৌগন্ধ্য কালাগুরু সৌরভের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে। কালিদাস বৃদ্ধ পরিব্রাজককে প্রশ্ন করেন, ভগবন্, আপনি অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, কৈলাসশিখরের উত্তরপ্রান্ত দিয়ে এদেশে এসেছেন। দুর্লভ আপনার অভিজ্ঞতা—পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ হিমালয় পর্বত, সিন্ধু-গঙ্গার ন্যায় নদ-নদী, গোবির ন্যায় মৃত্যু-স্বরূপিণী মরুভূমি অতিক্রম করেছেন। অনুগ্রহ করে বলুন, কোন্ প্রাকৃতিক দৃশ্যে আপনি সবচেয়ে অভিভূত হয়েছেন?

বৃদ্ধ বললেন, কবি, আমি তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিনি--আমি যে অপ্রাকৃতের সন্ধানে এ তীর্থযাত্রায় এসেছি!

অধোবদন হলেন কবি। বোধ করি ব্যথিত হলেন। পরিব্রাজক তখনও বলছেন, আমি এসেছিলাম মহাকারুণিকের লীলাক্ষেত্র দর্শন করে ধন্য হতে। আমি ধন্য। তবে 'অভিভূত' হওয়ার প্রসঙ্গই যখন উঠল তখন বলি—এই দীর্ঘ পদযাত্রায় দুইবার আমি অভিভূত হই। প্রথমত বৈশালী নগরপ্রান্তে আম্রপালীর জনমানবহীন অরণ্যে এবং দ্বিতীয়ত রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতচূড়ায় এক নির্জন রাত্রে। শেষোক্ত স্থানে আমি সমস্ত রাত্রি সম্পূর্ণ একাকী সুরঙ্গম 'সূত্র' গ্রন্থ আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করেছিলাম। আমার পথপ্রদর্শক এবং সঙ্গীরা নিষেধ করেছিল—জনমানবহীন অরণ্যে একাকী রাত্রিবাস তারা অনুমোদন করেনি। আমি তাদের নিষেধ শুনিনি। সেই রাত্রেই আমার পরমপ্রাপ্তি ঘটেছে। সে যে কী অনির্বচনীয় আনন্দ তা আমি ভাষায় ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।

: আর বৈশালী নগরপ্রান্তে সেই আম্রপালী কাননে?

: সে অভিজ্ঞতাও ব্যাখ্যার অতীত। মহাভিক্ষুণী আম্রপালীর কাহিনী মিলনান্তক। ঘৃণিত জীবন থেকে, বিম্বিসারের উপপত্নী পদ থেকে তাঁর উত্তরণ হয়েছিল মহাভিক্ষুণীর পদে—মহাকারুণিকের আশীর্বাদে। অথচ আশ্চর্য! তাঁর নামাঙ্কিত বিহারের ধ্বংসস্তূপের একান্তে বসে আমি সেদিন অকারণ অশ্রুপাত করেছিলাম। অহৈতুকী দুর্মনস্যতায় আমি কেন যে অভিভূত হয়েছিলাম তাও ব্যাখ্যার অতীত।

বৃদ্ধ নীরব হলেন। নৈঃশব্দ ঘনিয়ে আসে। ও প্রসঙ্গে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা অশোভন হবে বিবেচনা করে কবি প্রসঙ্গান্তরে আসেন। যেন বিশেষ করে ভিক্ষু তাও-চিংকে উদ্দেশ করেই বলেন, আপনি কাব্যশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। আমার একটি সমস্যার সমাধান করে দিন। আমি বর্তমানে যে কাব্যটি রচনা করছি তার নাম 'কুমারসম্ভবম্'। স্বয়ং মহাদেব এ কাব্যের নায়ক, পার্বতী উমা নায়িকা। কাব্যের বিষয়বস্তু এই রকম—তারকাসুরের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ দেবগণ ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা বললেন, মহেশ্বরের ঔরসে পার্বতীর গর্ভে এক অমিতবিক্রম পুত্রের জন্ম হবে—সেই পুত্র, 'স্কন্দ', তারকাসুরকে সংহার করবেন। সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব তখন ধ্যানমগ্ন, এদিকে সতী হিমালয়দুহিতা উমারূপে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। উমা যৌবনপ্রাপ্তা হওয়ার পরেও যখন মহেশ্বরের তপস্যাভঙ্গ হল না তখন দেবগণ মদনকে প্রেরণ করলেন। মদনের প্রচেষ্টায় মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ হল বটে, কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত হরের তৃতীয়নয়নজাত বহ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হয়ে গেলেন। মহাদেব যখন তপোভূমি ত্যাগ করে চলে গেলেন তখন আশাহতা উমা কঠিন তপশ্চর্যা শুরু করলেন। পরিশেষে উমার তপস্যায় প্রীত হয়ে মহেশ্বর তাঁর সমীপবর্তী হলেন। নায়ক-নায়িকার বিবাহ হল।

দীর্ঘ কাব্যের চুম্বকসার ব্যক্ত করে কবি নীরব হলেন।

তাও-চিং বললেন, সমস্যা তো একটি মাত্র দেখা যাচ্ছে...কন্দর্প যদি ভস্মীভূত হয়ে থাকেন তাহলে 'কুমারসম্ভব' হয় কী প্রকারে?'

কবি বলেন, আজ্ঞে না। সমস্যা সেটা নয়। সপ্তম সর্গে আমি হর ও পার্বতীর বিবাহ বর্ণনা করেছি এবং জানিয়েছি যে, মদনপত্নী রতির বিলাপে মর্মাহত মহাদেব মদনকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

ফা-হিয়েনের মুখাকৃতি দেখে আশংকা হয়—তিনি এ সংবাদে মর্মাহত।

তাও-চিং বলেন, তাহলে আপনার সমস্যা কিসের? প্রশ্নটা কি?

: আমার প্রশ্ন—কাব্য-কলা-সঙ্গত ন্যায়ে আমার কাব্য কি শেষ হয়েছে?

: অবশ্যই হয়েছে!

: কিন্তু এ-কাব্যে নাম-ভূমিকায় যাঁর অবতীর্ণ হওয়ার কথা তিনি যে এখন অনাগত।

: অনাগত হলেও তিনি অবশ্যম্ভাবী। প্রথম কথা, আপনার নায়ক এবং নায়িকা হিন্দুদিগের জগৎপিতা ও জগন্মাতা—তাঁদের দাম্পত্য-জীবন-বর্ণনা গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হবে; দ্বিতীয়ত, পরবর্তী সর্গ বাগ্‌বাহুল্যদুষ্ট হবে। কাব্য কিছু আভাস, কিছু ইঙ্গিতেই শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনি বলেছেন—নায়ক ও

নায়িকা পরস্পরের অনুরক্ত, বলেছেন কন্দর্প পুনরুজ্জীবিত এবং নায়ক ও নায়িকাকে এই অবস্থায় আপনি নির্জন বাসরঘরে প্রেরণ করেছেন। এর অনিবার্য পরিণাম সহজবোধ্য।

কবি কিছু বলার পূর্বেই ভিক্ষু ফা-হিয়েন বলে ওঠেন, মার্জনা করবেন আপনারা, আমি কিন্তু একমত হতে পারলাম না। আমি অবশ্য কাব্যশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ—হয়তো সেজন্যেই আমি ঐ অনিবার্য পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত হতে পারিনি।

কবি কি বলবেন ভেবে পেলেন না। মহা-অর্হৎ ফা-হিয়েন আজন্ম-ব্রহ্মচারী, সমাজবদ্ধ লৌকিক জীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এ-ক্ষেত্রে 'অনিবার্য পরিণাম' শব্দের যে ব্যঞ্জনা, তা তাঁর বোধগম্য না হতে পারে। ভিক্ষু ফা-হিয়েন বলেন, কবি, আপনার গল্পটি শুনলাম। এবার আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লব্ধ কাহিনী বলি। বাস্তব ঘটনা—

: বলুন মহাভাগ ?

: আমার কাহিনীর নায়ক একজন মুমুক্ষু কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, তিনি সদ্ধর্ম গ্রহণ করে মধ্য এশিয়ার পথে যাত্রা করেছেন, নায়িকা মধ্য এশিয়ার এক জনপদের অনিন্দ্যকান্তি কুমারভট্টারিকা। তুলনা করে বলা চলে—আমার নায়কও মদনকে ভস্ম করেছেন, আমার নায়িকাও হিমালয়দুহিতা রাজকন্যা।

এরপর কথাকোবিদের দক্ষতায় বৌদ্ধভিক্ষু বর্ণনা করিতে থাকেন বুদ্ধযশ এবং অক্ষুমতীর অনুরাগঘন কাহিনী—তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ, শৈলদেশবিহারে বুদ্ধযশ-এর উত্তরীয় প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি। প্রত্যাবর্তনের পথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে থাকেন—যেন কুমারজীবের কথিত কাহিনীর তিনি শ্রুতিধর। এরপর ভূমিকম্প এবং নির্জনগুহায় নায়ক-নায়িকার রাত্রিবাসের আয়োজন। বুদ্ধযশ সলজ্জে স্বীকার করলেন অক্ষুমতীর কাছে—একই শয্যায় নির্জন গুহাভ্যন্তরে রাত্রিযাপনে তাঁর সাহস নেই। তুষারপাত অগ্রাহ্য করে প্রহরায় রইলেন গুহামুখে। তারপর মধ্যরাত্রে গুহাভ্যন্তরে আর্ত গুমরানি শুনে তিনি প্রবেশ করলেন সেই বায়ুশূন্য অন্ধকূপে। দেখলেন—বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে রাজকন্যা মৃতপ্রায়। প্রত্যুৎপন্নমতি শ্রমণ নিরুপায় হয়ে রাজকন্যার অধরোষ্ঠ বিমুক্ত করে নিজ মুখ প্রবিষ্ট করালেন—ফুৎকারে প্রাণবায়ু দান করলেন। লক্ষ্য করলেন—দৃঢ়বদ্ধ কঞ্চুলিকার জন্য মূর্ছাভিভূতা অনাঘ্রাতা ষোড়শীর বক্ষ বিস্ফারিত হতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অনায়াসে তিনি উন্মুক্ত করে দিলেন তার বক্ষাবরণ, চীনাংশুক কঞ্চুলিকা। জ্যোৎস্নালোকে দেখতে পেলেন পূর্ণযৌবনা নারীর কুঙ্কুম-চন্দনচর্চিত যৌবনের যুগ্ম জয়স্তম্ভ। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিহরিত হয়ে উঠলেন বৌদ্ধভিক্ষু।

স্তব্ধ হলেন মহাভিক্ষু ফা-হিয়েন। জ্যোৎস্নালোকিত উদ্যানভূমিতে নেমে এল নৈঃশব্দ।

কালিদাস অধীর হয়ে বললেন, তারপর ?

: তারপর তো আর নেই কবি। আমার কাহিনী তো এখানেই শেষ।

: সে কি ! এস্থলে কাহিনী কী করে শেষ হবে ?

: কেন হবে না ? আমি অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি করেছি, নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, বলেছি গিরিমেখলবাহন পুনরুজ্জীবিত, বলেছি সেই রাত্রির তৃতীয় যামে নির্জন পার্বত্যগুহার ত্রিসীমানায় কোন নর-মানুষ নেই। এরপর কিছু বলা কাব্য-কলা-সঙ্গত ন্যায়ে বাগ্‌বাহুল্যদোষ দুষ্ট হবে না কি ?

কবি এবং তাও-চিং দীর্ঘ সময় নীরব রইলেন। অবশেষে কবি বললেন, আপনার বক্তব্য প্রণিধান করেছি প্রভু। অতঃপর কাহিনীটি সমাপ্ত করুন।

মৃদু হাসলেন ফা-হিয়েন। বললেন, শুনুন।

আদ্যন্ত সমস্ত কিছুই বর্ণনা করলেন। বুদ্ধযশ ও অক্ষমতীর উপসম্পদা গ্রহণ, অক্ষমতীর অপহরণ, হূণ সেনাপতির দ্বারা ধর্ষণ ও তার উপপত্নী হিসাবে ঘৃণিত জীবনের উপাখ্যান। স্বীকার করলেন—কীভাবে অক্ষমতী বিষপানে আত্মহত্যা করতে অস্বীকার করেন। অবশেষে জানালেন—কীভাবে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ভারত-বর্ষে এসে কাহিনীর নায়ককে জানিয়েছেন। এখানেই দ্বিতীয়বার কথ্যকাব্য শেষ হল।

জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমির দিকে দৃষ্টি মেলে কবি কালিদাস উদাসীন ভাবে বসে রইলেন। তাঁর দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন। অক্ষমতী ও বুদ্ধযশ-এর ব্যর্থ প্রেমকাহিনীর বেদনা তাঁর অনুভূতিপ্রবণ অন্তরে শেলের মত বিদ্ধ হয়েছিল। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলে তিনি দণ্ডায়মান হলেন। উত্তরীয়প্রান্তে চক্ষু মার্জনা করে বললেন, অনুমতি করুন মহাভাগ। রাত্রি গভীর হয়েছে।

ভিক্ষু তাও-চিংও কেমন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিও নিবদ্ধ ছিল জ্যোৎস্নালোকিত দূর দিগন্তে। কবির কথা বোধ করি তাঁর কর্ণগোচর হল না। অন্যমনস্কের মত বললেন, কোন্‌টা বরণীয় ? কাব্যের সত্য, না জীবনের সত্য ?

কবি বললেন, জীবনের জন্যই কাব্য, কাব্যের জন্য জীবন নয়।

কাহিনী সমাপ্ত করে ফা-হিয়েনও আত্মমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এ-সব কথোপকথন হয়তো তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশই করেনি। সহসা অপ্রাসঙ্গিক একটি কথা বলে উঠলেন তিনি, কবি ! এবার আপনি আমার একটি সমস্যার সমাধান করে দেবেন ?

কবি বলেন, আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি সামান্য কবি। আমি কী-ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি প্রভু?

: আপনার কবির দৃষ্টি দিয়ে। আপনি বলতে পারেন—অকল্যাণকারী সত্য এবং কল্যাণকারী মিথ্যা—এর মধ্যে কোন্‌টি বরণীয়?

: কল্যাণ ও অকল্যাণ শব্দদ্বয় আপেক্ষিক—সত্য ও মিথ্যা তা নয়।

: অর্থাৎ?

: সত্য কখনও অকল্যাণকারী হতে পারে না—দৃষ্টিবিভ্রমে মিথ্যা মরীচিকাকে কল্যাণকারী বলে ভ্রম হয়। সত্য সর্বদাই শিব ও সুন্দরের সহিত সম্পৃক্ত।

সে রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্বে চারজনই সিদ্ধান্তে এলেন। ব্যক্তিগত জীবনের মৌলিক সিদ্ধান্ত।

ভিক্ষু তাও-চিং সিদ্ধান্তে এলেন—এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতেই বাকি জীবন অতিবাহিত করবেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন না। তিনি ভারতীয় হয়ে যাবেন।

বুদ্ধভদ্র সিদ্ধান্তে এলেন—সদ্ধর্ম প্রচারে এই পরিব্রাজকদের মত তিনিও মহাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন—ফা-হিয়েনের সঙ্গে যাত্রা করবেন চীনের উদ্দেশে।

ফা-হিয়েন শয্যাগ্রহণের পূর্বে প্রার্থনা করলেন: হে লোকজ্যেষ্ঠ! তোমার স্বদেশবাসী কবির কণ্ঠে তুমি সত্যস্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছ। যে অন্যায় করেছি মহাজ্ঞানী কুমারজীব এবং মহাস্থবির বুদ্ধযশ-এর প্রতি তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ আমাকে দিও। কবির কণ্ঠে তোমারই কণ্ঠস্বর আজ শুনেছি: সত্য সর্বদাই শিব ও সুন্দরের সহিত সম্পৃক্ত।

শুধু সেই চৈত্যমন্দিরে উপস্থিত চতুর্থ ব্যক্তিটি আদৌ শয্যাগ্রহণ করলেন না। জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমি অতিক্রম করে যখন নিজ আবাসে উপনীত হলেন তখন মহাকালের মন্দিরে শয়নারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি স্তব্ধ হয়েছে। রজনী নিস্তব্ধ। পাটলিপুত্র নগরী সুষুপ্ত, শুধু অতন্দ্র প্রহরায় জেগে আছে শুক্লচন্দ্র। কবি দেখলেন, পরিচারক তাঁর আহার্য সাজিয়ে রেখে নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিয়েছে। আহার্যে তাঁর তখন রুচি ছিল না। হস্তপদ প্রক্ষালন করে তিনি তাঁর চিহ্নিত আসনে বসলেন। প্রদীপদণ্ডটি নিকটতর করলেন। মসীপাত্র, লেখনী, ভূর্জপত্র সাজিয়ে নিলেন।

ক্রমে তাঁর মুখ স্বপ্নাচ্ছন্ন হল। মনে মনে বললেন, হে জগৎপিতা, হে জগন্মাতা! তোমরা আমাকে মার্জনা কর। আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম—তারকাসুর এখনও এ ধরাধামে একছত্র—এখনও সে পৈশাচিক উল্লাসে হাসছে! হূণ সেনাপতিরূপে তাকে আজ প্রত্যক্ষ করেছি। তার নিধনের আয়োজন না করে

আমার মুক্তি নাই। মহাসন্ন্যাসীর মাধ্যমে তোমার নির্দেশ পেয়েছি প্রভু।

যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করে কবি লিখতে শুরু করলেন :

অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

'পাণিপীডনবিধেরনন্তরম্ শৈলরাজদুহিতুর্হরং প্রতি—

পাটলিপুত্র আটবীবিহার-পারাবতবিহার-বারাণসী !

মহাযান-বিহারে ফা-হিয়েন ছয় সহস্র শ্লোক-সমন্বিত 'সংযুক্তাভিধর্ম হৃদয় শাস্ত্রী' এবং তা ছাড়া নির্বাণ সূত্র, বৈপুল্য পরিনির্বাণ সূত্র, মহাসংঘিকাভিধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থের সন্ধান পান। দীর্ঘ তিন বছর ধরে তিনি ঐ সব অমূল্য গ্রন্থের একটি করে অনুলিপি প্রণয়ন করেন—স্বদেশে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তাও-চিং ভারতবর্ষেই তাঁর শেষ জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ফা-হিয়েন একাকীই স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করেন।

পাটলিপুত্র-বুদ্ধগয়া-চম্পানগর-তাম্রলিপ্ত।

তাম্রলীপ্ত সমুদ্রবর্তী সমতটের এক বৃহৎ বন্দর। মধুকর-সপ্তডিঙা-মকরমুখী-ময়ূরপঙ্খী প্রভৃতি অর্ণবপোতে বন্দর আকীর্ণ। ফা-হিয়েন এখানে দ্বা-বিংশটি বিহার প্রত্যক্ষ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এখানেও তিনি দুই বৎসর কাল নানা সূত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন এবং অগণিত বুদ্ধমূর্তির প্রতিকৃতি করিয়ে নেন।

তারপর বর্ষা-অন্তে এক শারদপ্রাতে বিরাট এক সওদাগরী অর্ণবপোতে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করলেন—সাত শত যোজন সমুদ্রপথ অতিক্রম করে এক-পক্ষকাল পরে উপনীত হলেন ভারতচরণ-চুম্বনরত সিংহল দ্বীপে। এখানেই অনুরাধাপুরে থূপারাম স্তূপ। সিংহলে পরিব্রাজক দীর্ঘ তিন বৎসর কাল বসবাস করেন। বিনয় পিটকের দীর্ঘাগম, সংযুক্তাগম ও সন্নিপাতসূত্রের অনুলিপি করে একদিন যাত্রা করলেন পূর্ব দিকে—শ্রীবিজয়ের পথে। শ্রীবিজয় অর্থে যবদ্বীপ। তিন মাস পরে উপনীত হলেন যবদ্বীপে।

পাঁচ মাস সেখানে অবস্থানের পর একদিন চীনযাত্রী এক সওদাগরী জাহাজে রওনা হলেন।

এই সমুদ্রযাত্রায় তিনি প্রচণ্ড ঝটিকার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ভার-লাঘবের উদ্দেশ্যে নাবিকেরা যাত্রীদিগের যাবতীয় মালপত্র সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করতে থাকে। ফা-হিয়েন তাঁর ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করতে থাকেন। প্রধান নাবিক যখন ফা-হিয়েনের অমূল্য গ্রন্থগুলি নিক্ষেপের জন্য অগ্রসর হল তখন বৃদ্ধ তার হাত দুটি ধরে বলেছিলেন—ওগুলির পরিবর্তে স্বয়ং আমি সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ছি। এ অর্ণবপোত চীনে যদি আদৌ উপনীত হয় তাহলে ঐ গ্রন্থগুলি চাংয়ান মহাবিহারে প্রেরণ করবেন।

সৌভাগ্যবশতঃ ফা-হিয়েনকে আত্মদান করতে হয়নি। তাঁর অমূল্য সম্পদও অক্ষত ছিল। দিকভ্রান্ত জাহাজ অবশেষে তীরের সন্ধান পেল। অজ্ঞাত উপকূলে অবতরণ করে তাঁরা জানতে পারলেন—এ দেশ মহাচীনই। অদূরে বিখ্যাত চৈনিক বন্দর লাওসান।

সমুদ্র অতিক্রম করে একজন অশীতিপর বৌদ্ধভিক্ষু তথাগতের জন্মভূমি থেকে এসেছেন এ সংবাদ বন্দরে প্রচারিত হতে দেরি হল না। নিকটবর্তী বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ভিক্ষুরা দল বেঁধে এলেন তাঁর সংগৃহীত ধর্মগ্রন্থাদি এবং বুদ্ধমূর্তি দেখতে। অচিরে প্রাদেশিক শাসনকর্তার কর্ণগোচর হল এ সংবাদ। তিনি স্বয়ং ফা-হিয়েনকে সম্বর্ধনা জানালেন। দ্রুতগামী সন্দেশবহ মারফৎ তিনি রাজধানীতে এ আনন্দ সংবাদ জানালেন এবং সসম্মানে ঐ বৌদ্ধ পরিব্রাজককে রাজধানী চাংয়ান অভিমুখে প্রেরণের জন্য একটি নৌকা প্রস্তুত করলেন। হোয়াং-হো নদীপথে পরিব্রাজক চললেন রাজধানীতে।

ই'তমধ্যে চীনের রাজনীতিতেও আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

পাঠকের নিশ্চয় স্মরণ আছে, আমরা মহা-থের কুমারজীবকে শেষ দেখেছি কাংসিতে। হুন সেনাপতির বন্দী হিসাবে তিনি যখন চীনের প্রবেশদ্বার ঐ কাংসিতে উপনীত হন, তখন তাঁর বয়ঃক্রম তেষট্টি। সেটা ছিল ৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। সেখানেই মহা-থের সংবাদ পান, যে বৌদ্ধ চীনাসম্রাট তাঁকে আনয়নের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন তিনি গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে নিহত। তাই মহাস্থবির কাংসু বিহারেই অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজধানীতে তাঁর আগমন হত নিরর্থক—কারণ নূতন চীনসম্রাট বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নাকি আদৌ উৎসাহী ছিলেন না।

সেসব ঘটনা দীর্ঘ উনত্রিশ বৎসর পূর্বেকার। ফা-হিয়েন যখন চাংয়ানে এসে উপনীত হলেন, তখন ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ। মহাস্থবির কুমারজীবের বয়স এখন একানব্বই। তিনি এখন আর কাংসুতে নেই—অধিষ্ঠান করছেন রাজধানী চাংয়ানের সর্ববৃহৎ সঙ্ঘারামে। ইতিমধ্যে চীনের সিংহাসনে আরূঢ় হয়েছেন আবার একজন নূতন

সম্রাট এবং তিনি পুনরায় পরম বৌদ্ধ। তুই পুরুষ পূর্বে মধ্যরাজ্য থেকে এক মহাপুরুষ চীনখণ্ডে এসে কাংস্থর অখ্যাত বিহারে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে আছেন শুনে তিনি সসম্মানে একটি স্বর্ণমণ্ডিত পল্যঙ্কিকা প্রেরণ করেছিলেন কাংস্থতে। সাড়ম্বরে মহাস্থবিরকে নিয়ে এলেন রাজধানীতে। জ্ঞানবৃদ্ধ মহাস্থবির যখন রাজ-সভায় উপনীত হলেন তখন সিংহাসন থেকে অবতরণ করে চীনাসম্রাট তাঁর পদতলে প্রণত হলেন। বললেন, মহা-থের আপনি আমার 'কুয়ো-শী' (রাজগুরু)। বলুন কীভাবে আপনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারি ?

ম্লান হেসেছিলেন মহাস্থবির। প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, সম্রাট মহানুভব। আমাকে আপনার বৌদ্ধ-ধর্মপুস্তকের গ্রন্থাগারটি উন্মুক্ত করে দিন। কিছু ভূর্জপত্র, মসী ও লেখনীর আয়োজন করুন। আমার আর কিছু প্রার্থনা নেই।

বিশ্বাস কথা কঠিন হয়ে পড়ে—চীনদেশে কুমারজীব একা-হাতে একশত ছাব্বিশখানি মহাযান ধর্মপুস্তক চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। তার ভিতর ছাপ্পান্নখানি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। অর্হৎ 'চিয়-মো-লো-শিহ' অমর হয়ে আছে চীনের গ্রন্থাগারে। ইতোমধ্যে ভারত ও মধ্যরাজ্য থেকে এসেছেন আরও অনেক পণ্ডিত—কুচীসঙ্ঘারামের মহা-থের বুদ্ধযশ, পাটলিপুত্রের গোতমবুদ্ধের বংশে জাত ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র প্রভৃতি। এ ছাড়া ছিলেন সেন-চাও প্রমুখ অসংখ্য চৈনিক পণ্ডিত। সেও যেন এক নবরত্নসভা !

পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যে বৎসর চীনের রাজধানী চাংয়ানে উপনীত হন—সেই ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দেই পরিনির্বাণ লাভ করেন এই শতাব্দীর সূর্য। এটুকুই ইতিহাস—বাকিটা ঔপন্যাসিক সত্য :

* * *

হোয়াং-হোতে উজান বেয়ে ড্র্যাগনমুখী সপ্তডিঙা যখন চাংয়ান বন্দরে ভিড়ল তখন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন। নৌকার সম্মুখভাগে যুক্তকরে তিনি দণ্ডায়মান—দেখলেন নদীতীরের ঘাট যেন এক জনারণ্য। হাজারে হাজারে চাংয়ানবাসী সমবেত হয়েছে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে। নদীতীরবর্তী হর্ম্যশীর্ষে নিশান, ঘাটের উপর প্রকাণ্ড একটি পুষ্পতোরণ। ঘাটের সোপানাবলীতে অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষু,—গৈরিক কাষায়, মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্রধারী চৈনিক শ্রমণদল। অশ্বারোহী সেনাবাহিনী শান্তিরক্ষা করছে। পীতধ্বজা-চিহ্নিত নৌকাটি দর্শনমাত্র সমবেত জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। রাজ-নিয়োজিত বাদকের দল তূর্যধ্বনি করতে থাকে।

বিনয়ের অবতার ফা-হিয়েন নৌকার সম্মুখভাগে বদ্ধাঞ্জলিপুটে তখন প্রার্থনা

মন্ত্র উচ্চারণ করছেন :

মেলো যথা একঘণো বাতেন না সমীরতি।
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা।[১৭]

নিজমনে শুধু বলছেন—'ফা-হিয়েন, ভুল করো না। এ সম্মান তোমার প্রাপ্য নয়। যে সম্পদ তুমি নিয়ে এসেছ তথাগতের জন্মভূমি থেকে—এ সম্মান তাঁরই প্রাপ্য।

পুষ্পমাল্য-আলিঙ্গন-প্রণাম-আশীর্বাদ।

নিজের অজ্ঞাতসারেই নৌকা থেকে অবতরণ করে তিনি উপনীত হলেন সম্রাট-প্রেরিত শকটে। সম্রাট স্বয়ং তাঁর প্রতীক্ষায় আছেন রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ মহা-সভায়। সেখানে নির্মিত হয়েছে সুউচ্চ মঞ্চ। আপামর জনসাধারণকে দর্শন দেবেন পরিব্রাজক। তথাগতের জন্মভূমির কথা বলবেন। আশীর্বাদ করবেন সকলকে।

দেখা হল পরিচিত অনেকের সঙ্গে। বুদ্ধযশ, বুদ্ধভদ্র, ভিক্ষু তাও-চিং প্রভৃতি। বুদ্ধযশকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন ফা-হিয়েন। তাঁকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করে বলেন, আপনি তাহলে আমাদের আমন্ত্রণে চীনখণ্ডে এসেছেন?

: এসেছি বন্ধু। আমি আপনাকে একটি বিশেষ সংবাদ জানাতে এসেছি। মহাস্থবির কুমারজীব আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। অনতিবিলম্বে।

: তিনি আছেন? কোথায়? কাংশুতে?

: না। এখানকার মহাসঙ্ঘারামে। তিনি মরণাপন্ন অসুস্থ—না হলে, স্বয়ং আসতেন।

: অবশ্যই যাব। আজই সন্ধ্যায়। আপনি মহা-থেরকে বলে রাখবেন।

সমস্ত দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল অনুভবই করতে পারলেন না ফা-হিয়েন। কিন্তু সন্ধ্যার সাক্ষাৎকারের কথা তিনি আদৌ বিস্মৃত হননি।

চাংয়ান শহরের এক প্রান্তে, নাগরিক কোলাহলের বাইরে হোয়াং-হো তীরে এই শান্ত সঙ্ঘারাম। অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষুর আবাস। বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে আশ্রমের আয়োজন। মধ্যস্থলে স্বর্ণমণ্ডিত এক প্যাগোডা বা চৈত্যগৃহ। অর্ধচন্দ্রাকারে আবাসিকদের বিহার। চৈত্যসংলগ্ন একটি নির্জন পরিবেশ। কুমারজীব এই সঙ্ঘারামের মহাস্থবির; তিনি 'কুয়োশী'।

ফা-হিয়েনের শকট যখন এই সঙ্ঘারামের সমীপস্থ হল, তখন দেখা গেল সঙ্ঘারামের সকল ভিক্ষুই তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে সমবেত হয়েছেন। প্রবেশ-তোরণের ভিতর শকটের প্রবেশে কোন অন্তরায় ছিল না, কিন্তু পরিব্রাজক রাজ-

পথেই রথ রক্ষা করতে বললেন। পদব্রজেই উদ্যানপথ অতিক্রম করে উপনীত হলেন চৈত্য-সংলগ্ন মহাস্থবিরের পরিবেশে।

ভূশয্যার উপর কম্বলাসনে একটি উপাদানে দেহভার ন্যস্ত করে একানব্বই বৎসরের স্থবির কুমারজীব অর্ধশায়িত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমরা যে শালপাংশু দীর্ঘদেহীকে দেখেছিলাম—তাঁকে চিহ্নিত করার মত অভিজ্ঞান শুধু তাঁর অনির্বাণ জ্যোতিতে। দেহচর্ম লোল, মুখ বলিরেখাঙ্কিত। দুই হস্ত উত্তোলন করে মহাস্থবির আহ্বান করলেন ফা-হিয়েনকে।

সেই সন্ধ্যাটি চাংয়ান মহাসঙ্ঘারামে অবিস্মরণীয়। ফা-হিয়েন তাঁর ভ্রমণকথা বহুবার বহুলোককে বলেছেন। পুনরায় বিবৃত করলেন। আনুপূর্বিক। নিমীলিত নেত্রে মহাস্থবির যেন প্রত্যক্ষ করতে থাকেন সেই সব মহাতীর্থ—লুম্বিনীকাননে বুদ্ধজন্ম, কপিলাবস্তুতে গৃহত্যাগ, আড়াঢ় কলম-উদ্দক রামপুত্তের আশ্রম, রাজগৃহের বেণুবন বিহার, উরুবিল্ব, ঋষিপত্তন! কত স্মৃতি, কত কাহিনী, কত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত একাধিকবার পাঠ করেছেন কুমারজীব, কণ্ঠস্থ আছে আদ্যোপান্ত—তবু প্রত্যক্ষদর্শীর এ বিবরণে যেন তাঁর প্রাপ্য-প্রাপ্তি ঘটল। দীর্ঘ কাহিনী সমাপ্ত হল কুশীনগরে—গণ্ডক নদীতীর সন্নিকটে শালবৃক্ষদ্বয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে শায়িত বর্তমানকল্পের মানুষীবুদ্ধ শাক্যসিংহের মহাপরিনির্বাণে।

মহাস্থবির যুক্তকরে নমস্কার করলেন। তাঁর পরিনির্বাণও আসন্ন। তিনি প্রহর গুনছেন শুধু।

যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করে অস্ফুটে মন্ত্রোচ্চারণ করেন :

"উপনীতবয়ো চ দানি'সিম্
সম্পয়াতো'সি যমস্স সন্তিকে,
বাসোপি চ তে নত্থি অন্তরা
পাথেয়্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি।
সো করোহি দীপমত্তনো খিপ্পং
বায়াম পণ্ডিতো ভব,
নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো ন পুন
জাতিজরং উপেহিসি।[১৭]

ফা-হিয়েন বলেন, প্রভু, ভ্রমণকালে বহুস্থানে বহু বিভ্রান্তিকর কাহিনী শুনেছি, যার অন্তর্নিহিত অর্থ বোধগম্য হয়নি ; উপযুক্ত গুরুরও সন্ধান পাইনি, যিনি আমার সন্দেহ নিরাকরণ করতে সক্ষম।

: যথা?

: গৃধ্রকূট পর্বতচূড়া হতে প্রত্যাবর্তনের সময় 'কারণ্ড বেণুবন' প্রান্তরে আমি দুটি পাশাপাশি পার্বত্যগুম্ফা দেখেছিলাম—'পিপুল গুহা' এবং 'সপ্তপর্ণী গুহা'। স্থানীয় বৌদ্ধশ্রমণেরা আমাকে জানালেন, "গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের অব্যবহিত পরে সেই স্থলে পাঁচশতজন প্রধান বৌদ্ধ-অর্হৎ বৌদ্ধসূত্রগুলি সঙ্কলন করার নিমিত্ত সম্মিলিত হন। সেই ধর্মমহাসভায় সভাপতিত্ব করেন অর্হৎ মহাকাশ্যপ স্বয়ং। অগ্রসেবক সারিপুত্ত এবং মহামৌদ্গল্ল্যায়নও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। শুধু ভিক্ষু আনন্দ গুহাদ্বারেই অবস্থান করেছিলেন—কারণ মহাসভায় প্রবেশে তিনি অনুমতি পান নাই।"[২০]—এখন আমার প্রশ্ন, মহাঅর্হৎ ভিক্ষু আনন্দকে কেন এ সভায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হল না?

কুমারজীব বললেন, এ সকল কাহিনী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য জানি না। অগ্রসেবক সারিপুত্ত এবং মহামৌদ্গল্ল্যায়নের পরিনির্বাণ গৌতমের পূর্বে হয়েছিল কি পরে হয়েছিল এ বিষয়েই সন্দেহ আছে আমার। তাছাড়া আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, ভিক্ষু আনন্দ ছিলেন ভগবান বুদ্ধের সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য। তিনি ছিলেন শাক্যমুনির প্রথম ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং তথাগতের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির মুহূর্তে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অপরাপর অর্হৎদিগের মত ইনি জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন না—আনন্দ ছিলেন আনন্দস্বরূপ। অমিতাভ ধ্যানীবুদ্ধের বোধিসত্ত্ব যেমন অবলোকিতেশ্বর,—ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ প্রভৃতি মানুষী বুদ্ধগণের বোধিসত্ত্ব যেমন যথাক্রমে শকমঙ্গল, কনকরাজ এবং ধর্মধারা তেমনই বর্তমানকল্পের মানুষীবুদ্ধ শাক্যসিংহ তাঁর অগণিত শিষ্যের ভিতর ঐ ভিক্ষু আনন্দকেই নির্বাচন করেছেন স্বীয় বোধিসত্ত্বরূপে। মহাপরিনির্বাণকালে তাঁকেই তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেন—তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি দান করে যান। আপনি যে কাহিনী বিবৃত করলেন তাতে বোধ করি ইঙ্গিত রয়েছে—সেজন্য অন্যান্য অর্হতেরা আনন্দের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। আমার তা আদৌ বিশ্বাস হয় না।

ফা-হিয়েন কৌতুক করে বলেন, শাক্যসিংহের প্রত্যক্ষ-শিষ্যরা নিশ্চয় নির্লোভ ছিলেন, কিন্তু মার্জনা করবেন মহা-থের—আমরা অতটা নির্লোভ নই। জনান্তিকে তাই জানাই—আপনার ঐ আখরোট কাঠের ভিক্ষাপাত্রটি পবিত্র স্মৃতি হিসাবে লাভ করার বাসনা আমরা সকলেই অন্তরে পোষণ করি—আপনার প্রিয়শিষ্য বুদ্ধযশ, বুদ্ধভদ্র, তাও-চিং, সেন-চাও এবং আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি নিজেও!

প্রশান্ত হাসলেন কুমারজীব। প্রসঙ্গান্তরে এলেন তৎক্ষণাৎ। বললেন, ভদন্ত, শুনেছি বুদ্ধভূমি থেকে আপনি বহুসংখ্যক ধর্মগ্রন্থাদি অনুলিপি করে এনেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে সেগুলি এই মহাবিহারে আনয়ন করুন। সেগুলি

অবিলম্বে চীনাভাষায় অনূদিত হওয়া প্রয়োজন। আমার অবশ্য দৃষ্টিশক্তি নাই—বুদ্ধযশ, বুদ্ধভদ্র, সেন-চাও প্রভৃতিরা আছেন—

ফা-হিয়েন বলেন, আপনার অনুমতি পেলে আমি নিজেও আছি—

: না ভদন্ত, সে কাজ আপনার নয়। চীনা ও সংস্কৃত দুই ভাষায় যুগপৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন এমন শ্রমণের অভাব নাই এখানে। আপনার ক্ষেত্র ভিন্ন। আপনি একটি ভ্রমণকাহিনী রচনা করুন। তথাগতের লীলাক্ষেত্রের আপনি প্রত্যক্ষদর্শী ; এইমাত্র আপনি স্বীকার করলেন—নানা প্রক্ষিপ্ত কাহিনী তাঁর জীবনীতে প্রবেশ করেছে ইতোমধ্যেই। না, না, এ হতে পারে না। আপনি যা দেখেছেন, যা বুঝেছেন—ভারতভূমির ধর্ম-কর্ম-জীবনযাত্রার যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আপনি লাভ করেছেন সেটা লিপিবদ্ধ করাই আপনার ব্রত। ভবিষ্যৎ কাল আপনার কাছে সেটাই প্রত্যাশা করছে। সে গ্রন্থের নাম হবে 'ফো-কু কি' অর্থাৎ 'বুদ্ধভূমির বিবরণ'। অনাগত কাল আপনার গ্রন্থের ভিতরেই পাবে আমাদের কালের পরিচয়।

: যথা আজ্ঞা মহা-থের।

বিদায় গ্রহণের পূর্বে ফা-হিয়েন বলেন, প্রভু! আর একটি নিবেদন আছে ; সেটি কিন্তু গোপন কথা। শুধু আপনাকেই নিবেদন করতে ইচ্ছুক।

শ্রবণমাত্র অন্যান্য ভিক্ষুদল মহা-থেরকে প্রণাম করে পরিবেণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ফা-হিয়েন বলেন, প্রভু! আমি পাপী। একটি পাপকার্য করেছি আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে। আমি সজ্ঞানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম। 'মিথ্যাই কল্যাণকর'—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সেসময় মিথ্যাচার করেছিলাম। কিন্তু ভারত ভ্রমণকালে এক তরুণবয়স্ক কবির কথায় আমি বুঝতে পারি—আমি অন্যায় করেছিলাম। এ-কথা এতদিন গোপন রেখেছি—আজ সমস্ত বৃত্তান্ত আপনার চরণমূলে নিবেদন করে মিথ্যাভাষণের অপরাধে পাতিমোক্ষমতে আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আপনি বিধান দিন।

কুমারজীব বলেন, তৎপূর্বে বলুন, কী সেই ভারতীয় কবির পরিচয় এবং কী বলেছিলেন তিনি?

: তিনি একজন তরুণবয়স্ক অখ্যাত ব্রাহ্মণ। নাম ভট্ট কালিদাস। তিনি বলেছিলেন,—'মিথ্যা কখনও কল্যাণকর হতে পারে না', বলেছিলেন 'সত্য সর্বদা শিব ও সুন্দরের সহিত সম্পৃক্ত।'

কুমারজীব বললেন, তরুণবয়স্ক হলেও তিনি প্রকৃত জ্ঞানী। এক্ষণে

সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বলুন। পাতিমোক্ষমতে আমি বিধান দেব। মাননীয় ভিক্ষু, আমি কর্ণময়!

ফা-হিয়েন আদ্যন্ত ঘটনাটি বিবৃত করার পর ভিক্ষু কুমারজীব বললেন, এক্ষণে বলুন ভদন্ত, আপনি কেন সজ্ঞানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন?

যুক্তকরে ফা-হিয়েন প্রত্যুত্তর করলেন, আমার উদ্দেশ্যের কথা ইতিপূর্বেই নিবেদন করেছি প্রভু। স্বয়ং তথাগত বলেছেন, "তমেব বাচং ভাসেয্য যায়ত্তানাং ন তাপয়ে/পরে চ ন বিহিং সেব্য সা বে বাবা সুভাসিতা।" (যে বাক্য উচ্চারণে নিজে পীড়িত হতে হয় না সেরূপ বাক্যই বলিবে, যে বাক্য অপরকে কষ্ট দেয় না সেই বাক্যই উত্তম)। তিনি আরও বলেছেন, "পিয়বাচমেব ভাসয্য যা বাচা পাটনক্রিতা/যং অনাদায় পাপানি পরেসং ভাসতে পিয়ং॥" (যে বাক্য সকলকে আনন্দ দেয় সেরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিবে—যে বাক্য অপরের অনিষ্টদায়ক না হইয়া প্রিয় হয় সেইরূপ বাক্যই বলিবে।)

কুমারজীব বললেন, কিন্তু ভদন্ত! এই মিথ্যাভাষণে আপনি নিজেই পীড়িত হয়েছেন—নিরন্তর ত্রিশ বৎসরকাল আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়েছেন।

: তা হয়েছি। তবু একটি সান্ত্বনা আমার ছিল—'যং অনাদায় পাপানি পরেসং ভাসতি পিয়ং'—আমার ঐ মিথ্যাচার কারও অনিষ্টসাধন করেনি, পরন্তু আপনাকে সান্ত্বনা দিয়েছে।

অমলিন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কুমারজীবের বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল। বললেন, মাননীয় ভিক্ষু ফা-হিয়েন, এক্ষণে আপনার অবহিত হওয়ার সময় হয়েছে যে, ত্রিশ বৎসর পূর্বে উচ্চারিত আপনার সেই মিথ্যা স্তোকবাক্য আমাকে আদৌ কোনও সান্ত্বনা দেয়নি, পরন্তু আমাকে শুধু পীড়িতই করেছে।

: কেমন করে প্রভু?

: আমিও যে আজ ত্রিশ বৎসর ধরে অন্তর্দাহে দগ্ধ হচ্ছি আপনার মিথ্যাচারে। আমি যে সেই মুহূর্তেই অনুভব করেছিলাম—আপনি আমাকে সান্ত্বনা দানের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন। অক্ষমতী যে জীবিতা তা আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম। তখনই তা জানতাম আমি।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভিক্ষু ফা-হিয়েন। বললেন; কেমন করে প্রভু? কোনও অলৌকিক ক্ষমতার বলে?

: না। আজীবন যে মহাভিক্ষু মিথ্যার আশ্রয় নেননি, তাঁর পক্ষে জীবনে

প্রথম মিথ্যাভাষণের সময় যে প্রতিক্রিয়া হয় সেটুকু অনুভব করার মত সাধারণ জ্ঞানও কি আমার নেই?

অধোবদনে ভিক্ষু ফা-হিয়েন বললেন, প্রভু! তাহলে তখনই আমাকে বলেননি কেন? কেন আমাকে মিথ্যাচার-পরিশুদ্ধ করে তোলেননি?

কুমারজীব প্রত্যুত্তরে শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করলেন:

"অত্তান'ব কর্তং পাপং অত্তনা সংকিলিস্সতি,
অত্তনা অকতং পাপং আত্তনা'ব যিমুজ্মতি,
সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং নাঞ্‌ঞো অঞ্‌ঞং বিসোধয়ে॥"

[নিজের কৃত পাপে নিজেই সংক্লিষ্ট হয়। নিজে পাপ না করিলে নিজেই বিশুদ্ধ থাকে। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি নিজেরই সৃষ্টি। কেহ কাহাকেও পরিশুদ্ধ করিতে পারে না।]

ফা-হিয়েন সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন মহাস্থবিরের চরণমূলে।
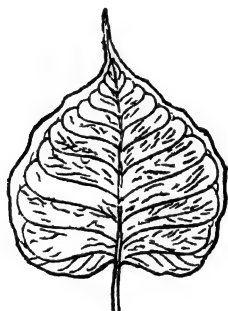
পরদিন সম্পূর্ণ একাকী একটি নৌকাযোগে ভিক্ষু ফা-হিয়েন চাংয়ান শহরের পশ্চিমে হোয়াং-হো তীরবর্তী একটি শান্ত গ্রামে উপনীত হলেন। শহর থেকে দশ 'লী' উজানে। বুদ্ধভদ্র তাঁর সঙ্গে আসতে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সম্মত হননি চৈনিক পরিব্রাজক। বলেছিলেন, পাতিমোক্ষমতে আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছি বন্ধু। এ পথ একলা চলার।

হোয়াং-হো তীরে এক নির্জন ঘাটে তরী তীরসংলগ্ন হল। বিহঙ্গ-কূজিত শান্ত গ্রাম্যপথ। দূরে ক্ষেতে-খামারে ন্যুব্জপৃষ্ঠ কৃষক ভূমিকর্ষণরত। মনুষ্যচালিত লাঙল। ক্রীতদাস। পীত উত্তরীয়ধারী অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রমণ ধীরপদে সেই গ্রাম্যসরণী অতিক্রম করে অবশেষে উপনীত হলেন টিলার উপরে দুর্গাকারে নির্মিত এক ত্রিভূমিক জীর্ণ প্রাসাদের সম্মুখে। প্রাচীর-বেষ্টিত একটি উদ্যানগৃহ—অতীত কালের কোন ধনবান রাজপুরুষের বিলাসভবন। এককালে সুরা ও নারীর প্রাচুর্যে

সে উদ্যানবাটিকা কলমুখরিত থাকত। বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ। জীর্ণ প্রাসাদের একাংশ বিধ্বস্ত—অপরাংশের আকৃতি বলিরেখাঙ্কিত জরাগ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রীর মত। ভগ্নদশাপ্রাপ্ত মর্মর প্রস্রবণ, কণ্টকগুল্মাবৃত কুঞ্জবিতান, ক্ষতচিহ্ন-আকীর্ণ উদ্যান-পথে ভূশয্যালীন নগ্ন নারীর মর্মর মূর্তি। দ্বিতল বাটির চতুর্দিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু পর্ণকুটীর—গৃহাভ্যন্তর থেকে উত্থিত হচ্ছে একটি নিরবচ্ছিন্ন শব্দ। পরিচিত শব্দ। তন্তুবায় তাঁত পরিচালনা করছে। গবাক্ষ-পথে দুই একজনকে দেখাও যায়। তারা সকলেই নারী, পুরুষ নয়—সকলেই প্রৌঢ়া অথবা বৃদ্ধা।

একটি পুষ্পপত্রহীন বিশুষ্ক চেরীবৃক্ষতলে পাঁচ-সাতজন রমণী—তাঁরাও পঞ্চাশোর্ধ্বা—সীবনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ভিক্ষাপাত্র হস্তে পীতবসনধারী ভিক্ষুকে অগ্রসর হতে দেখে সকলেই দণ্ডায়মানা হন। বদ্ধাঞ্জলিপুটে প্রণতি জানান। ফা-হিয়েন আশীর্বাদ করে বলেন, এইটাই কি লি-চিয়াঙ গ্রামের মাতৃকাসদন ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ, থের। অনুগ্রহ করে আমার অনুগমন করুন। আপনি পথশ্রান্ত, আতিথ্য গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করুন।

ফা-হিয়েন বললেন, আমি পথশ্রান্ত অতিথি নই মা, আমি বিশেষ কারণে এ আশ্রমে সমাগত। আমি আশ্রমমাতৃকার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

: আসুন মহাভাগ। তিনি মন্দিরে আছেন।

মন্দির অবশ্য গৌরবে। প্রাসাদ-ধ্বংসস্তূপ-সংলগ্ন একটি ভগ্নপ্রায় কক্ষ। সে কক্ষে কোন বিগ্রহ নাই, শুধু কেন্দ্রস্থলে মৃত্তিকা-নির্মিত একটি স্তূপের অক্ষম প্রয়াস। তার গঠন-সৌকর্য দেখে আশঙ্কা হয় আশ্রমিক মহিলাবৃন্দ অপটুহস্তে সেটি নির্মাণ করেছেন। ফা-হিয়েন সেই মৃত্তিকাস্তূপের সম্মুখে প্রণত হলেন। কক্ষাভ্যন্তর থেকে নির্গত হয়ে এলেন এক বৃদ্ধা। আনুমানিক ষাট বৎসর বয়ঃক্রম তাঁর। নিরাভরণ দেহ, অঙ্গে একটি শুভ্র কার্পাসবস্ত্র—পীত বা গৈরিক নয়। তাঁর মস্তকও মুণ্ডিত নয়, অযত্নবিন্যস্ত ফেনশুভ্রকেশরাশি স্কন্ধের উপর কুণ্ডলায়িত। মুখে বলিরেখা চিহ্নের আভাস—তবু তাঁর চম্পকগৌর বর্ণ অম্লান। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না—যৌবনকালে তিনি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন।

পথপ্রদর্শিকা বললেন, মা, ইনি আপনার দর্শনপ্রার্থী।—চলে গেলেন তিনি।

আগন্তুক ভিক্ষুকে প্রণাম করলেন বৃদ্ধা। ভিক্ষু বললেন, আরোগ্য।

বিনা বাক্যব্যয়ে বৃদ্ধা পূর্বসঞ্চিত এক পাত্র কূপোদক নিয়ে আসেন।

অতিথির পদপ্রক্ষালনান্তে স্বীয় অঞ্চলে তাঁর চরণদ্বয় বিশুষ্ক করে বললেন, আসন গ্রহণ করুন মহাভাগ।

একটি মৃগচর্মাসন বিছিয়ে দেন পাষাণচত্বরে।

আসন গ্রহণ করে ললিতাসনে বসলেন ফা-হিয়েন। বললেন, আপনিই এই মাতৃকাসদনের আশ্রমমাতা—অ-থু-মো-তি ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ ভদন্ত। আজ্ঞা করুন ?

: আমি ভিক্ষু ফা-হিয়েন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মত সচকিত আশ্রমমাতৃকা বলেন, ভিক্ষু ফা-হিয়েন ! অর্থাৎ আপনিই কি সেই বিখ্যাত পরিব্রাজক যিনি বুদ্ধভূমি প্রত্যক্ষ করে পরশ্ব সন্ধ্যায় জীবিত প্রত্যাবর্তন করেছেন ?

: হ্যাঁ আশ্রমমাতা। আমিই সেই পরম সৌভাগ্যবান !

: আমার এ পর্ণকুটীর আজ ধন্য। কিন্তু…কিন্তু এই নগণ্য গ্রামে কেন এসেছেন ভদন্ত ?

: আমি আপনার কাছেই এসেছি আশ্রমমাতৃকা।

: কিন্তু কেন ? কেন এভাবে সম্মানিত করলেন আমাকে ? কোন্ পুণ্যে ?

: আমি ভিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছি তোমার কাছে—

ফা-হিয়েন দুই হস্তে ভিক্ষাপাত্রটি উপস্থাপিত করেন। শিহরিতা হয়ে ওঠেন বৃদ্ধা। দুই হস্তে মুখ আবৃত করে আর্তকণ্ঠে বলেন, এমন কথা :বলবেন না মহাভাগ। আমি পাপী, আমি সামান্যা। আমি কী ভিক্ষা দেব আপনাকে ?

: তোমার সর্বস্ব দিতে হবে অ-থু-মো-তি !

ধীরে ধীরে মুখ হতে হস্তদ্বয় অপসারিত হয়। বৃদ্ধা বলেন, আমি এখনও প্রণিধান করতে পারছি না মহা-থের, আপনি এভাবে আমার কাছে কেন এসেছেন ?

: তুমি কি ইতিপূর্বে আমাকে কখনও দেখেছ ?

: না। আপনি যে তথাগতের জন্মভূমি পরিক্রমায় গিয়েছিলেন তাও অজ্ঞাত ছিল আমার। বস্তুত মাত্র গত পরশু আপনার নাম ও ভ্রমণের কথা জেনেছি।

: ভুল করছ আশ্রমমাতৃকা। আমি তোমার পূর্বপরিচিত। সে পরিচয় এখনই প্রদান করছি। তার পূর্বে বল—এ আশ্রমে কতজন ভিক্ষুণী আছেন ?

: ভিক্ষুণী একজনও নাই ভদন্ত। এঁরা সকলেই পতিতা, সমাজত্যক্তা। যতদিন যৌবন ছিল এঁরা দেহ দিয়ে সমাজসেবা করেছেন—এখন এঁরা উপেক্ষিতা, পরিত্যক্তা।

: এ আশ্রমভূমি কার সম্পত্তি ? তোমার ?

: না। স্বর্গত হূণ সেনাপতি হো লু-স্থনের। বর্তমানে তাঁর পুত্রের। এ উদ্যানবাটিকা হূণ সেনাপতির প্রমোদভবন ছিল—এক্ষণে পরিত্যক্ত। আমাদের বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়েছে মাত্র।

: তুমি তো মহাযানী ; তাহলে এ মন্দিরে বুদ্ধমূর্তির প্রতিষ্ঠা না করে স্তূপপূজা করছ কেন ?

বৃদ্ধা বললেন, ভগবন্, আমি মহাযানী নই, বস্তুত আমি বৌদ্ধই নই। পাতিমোক্ষমতে আমার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল ; কিন্তু আমি সে দণ্ডাদেশ অনুসারে আত্মহত্যা করতে পারিনি। শাস্ত্রমতে আমি বোধ করি জীবিতা নই, আমি এক জীবন্ত প্রেতিনী।

: না, অ-খু-মো-তি! মহা-থের তোমাকে তো শুধু মৃত্যুদণ্ডই প্রদান করেননি, ঐ সঙ্গে দিয়েছিলেন আর একটি মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্র। 'নামরূপ'কে অস্বীকার করে মৃত্যুকে উত্তরণের মন্ত্রও তো তিনিই দিয়েছিলেন—তাই নয় ? রুদ্রদেবের সেই বজ্র-আশীর্বাদ বুক পেতে নেবার শিক্ষাও তো তাঁরই ?

বৃদ্ধা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, আপনি কি অন্তর্যামী ?

: না। এ ভ্রম অবশ্য তোমারই প্রথম হল না। ইতিপূর্বে আরও একজন ঐ প্রশ্ন আমাকে করেছিলেন। তিনিও তোমার পরিচিত। তিনি কুচীনগরীর মহাস্থবির : বুদ্ধযশ।

বৃদ্ধা বজ্রাহত!

ফা-হিয়েন বলেন, আশ্রমমাতৃকা! তুমি আম্রপালীর কাহিনী জান ?

আশ্রমমাতৃকা তখনও প্রকৃতিস্থা হতে পারেননি। ফা-হিয়েন বলে চলেন ভিক্ষুণী আম্রপালীর বিচিত্র কাহিনী। রাজা বিম্বিসারের উপপত্নী থেকে যাঁর উত্তরণ হয়েছিল মহাভিক্ষুণীর পদে। উপসংহারে বলেন, বৈশালী নগরীর ধ্বংসস্তূপে সেই আম্রপালী কাননে অঝোরধারায় আমি একদিন অশ্রুপাত করেছিলাম। কেন বলতে পার আশ্রমমাতৃকা ?

: না। কেন ?

: আমার অবচেতন মন জানতে চাইছিল—বিম্বিসারের উপপত্নী যদি ভিক্ষুণী আম্রপালী হতে পারেন, তাহলে অ-খু-মো-তি কেন পুনরায় অগ্‌গবিনতা অক্ষমতী হতে পারবে না ?

অক্ষমতী অধোবদনে বলে, জানি না কেমন করে আপনি আমার পূর্বজীবন-কথা জেনেছেন। মনে হচ্ছে আমি যেন পূর্বনিবাসজ্ঞান লাভ করেছি। তথাগতের মত জাতিস্মর হয়ে বিস্মৃত অতীত জীবনকে প্রত্যক্ষ করছি।

ফা-হিয়েন বলেন, অতীতেই দৃষ্টিপাত কর আম্রমমাতৃকা। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে হূণ সেনাপতি হো লু-স্থনের অবরোধে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তুমি আমাকে প্ররোচিত করেছিলে মহাস্থবির কুমারজীবকে তোমার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ নিবেদন করতে। পাপ আমিও করেছি—সেই মিথ্যাকেই কল্যাণকর বিবেচনা করে আমি মিথ্যাচরণ করেছিলাম। তখনও আমার জানা ছিল না—একমাত্র 'সত্য সর্বদাই শিব ও সুন্দরের সহিত সম্পৃক্ত'।

মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি অক্ষমতী বলে, মনে পড়েছে। আপনিই যে সেই ভিক্ষু তা আমি অনুমান করতে পারিনি।

ফা-হিয়েন তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি প্রসারিত করে বলেন : এবার আমাকে ভিক্ষা দাও অক্ষমতী। তোমার সর্বস্ব।

: কেমন করে দেব থের? কীটদষ্ট কুসুমে কি অর্ঘ্য হয়?

: সে কথাই তো বলে গেছেন আম্রপালী—কীটের অপরাধে কুসুম অপবিত্র হতে পারে না।

: কিন্তু মহাস্থবির কুমারজীব যে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন?

: সে লীলার কৈফিয়ৎ একমাত্র মহাস্থবিরই দিতে পারেন। বোধ করি 'ইতিগজ'র অস্তিত্ব যেমন প্রমাণ দেয় যুধিষ্ঠির পুরোপুরি দেবতা নন, তিনি মর-মানুষ, তেমনি তোমার হাতে বিষের পুরিয়া তুলে দিয়ে মহাস্থবির প্রমাণ রেখে গেলেন—তিনি পূর্ণবুদ্ধ নন, রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষরূপী অবতার। তোমাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে সেই মহাস্থবিরের কাছে। তিনি তোমার প্রতীক্ষারত। তিনি মৃত্যুশয্যায়।

: তিনি কি জানেন আমি জীবিত?

: জানেন। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। জেনেছেন আরও একজন। তাঁর প্রিয় শিষ্য বুদ্ধযশ।

: বুদ্ধযশ! তিনি চাঙ-য়ানে? চীন দেশে?

: হ্যাঁ। আজ দশ বৎসরকাল। তাঁরা তোমার প্রতীক্ষায় আছেন অক্ষমতী। সঙ্ঘ তোমাকে ডাকছে। শুনতে পাচ্ছ না?

দূর দিগন্তের দিকে কয়েকটি মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন অক্ষমতী। তারপর বলেন, হ্যাঁ ভদন্ত, শুনতে পাচ্ছি।

চাঙ-য়ান শহরতলীতে মহাসঙ্ঘারামে ওঁরা দুজন যখন এসে উপনীত হলেন তখন সে মহাতীর্থ জনারণ্যে পরিণত। সমস্ত নগরবাসী বৌদ্ধ সমাগত হয়েছেন

তাঁদের মহাস্থবিরকে শেষ বিদায় জানাতে। শতাব্দীর সূর্য অস্তমিত হচ্ছেন। এসেছেন স্বয়ং চীন সম্রাট —তাঁর কুমারজীবকে শেষ প্রণাম নিবেদনে।

অতি প্রত্যুষেই লক্ষিত হয়েছে মহাস্থবির চিয়ু-মো-লো-শিহ্ তাঁর মরজীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত। তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে গেছে। জ্ঞান আছে কিন্তু সম্পূর্ণ।

সোপানাবলী অতিক্রম করে ভিক্ষু ফা-হিয়েন প্রবেশ করলেন বিরাট কক্ষে; তাঁর অনুগমন করলেন এক নতমুখী বৃদ্ধা। প্রকাণ্ড কক্ষে শতাধিক বৌদ্ধশ্রবণ—কিন্তু সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। মহাস্থবির ভূ-শয্যালীন। তাঁর পদতলে চীন সম্রাট। বুদ্ধযশ, বুদ্ধভদ্র, বিমলাক্ষ, তাও-চিং, সেন-চাও প্রভৃতি প্রধান অর্হতেরা তাঁকে ঘিরে আছেন।

ফা-হিয়েন তাঁর পদতলে উপবেশন করলেন। চরণস্পর্শ করলেন। নিমীলিত চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত হল। ফা-হিয়েন বললেন, অগ্‌গবিনতা অক্ষমতী এসেছেন প্রভু। তিনি বলছেন, বিদায় নেবার পূর্বে আপনি পাতিমোক্ষতে তাঁর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়ে যান।

মহাস্থবিরের চক্ষু-তারকায় প্রতিবিম্বিত হল শুভ্রবসনা এক নতমুখী বৃদ্ধার প্রতিমূর্তি। জাগতিক বন্ধন ক্ষীণ হয়ে আসছে, তবু অন্তিম-মুহূর্তে চিনতে পারলেন সেই মহিমময়ী নির্বাতিতাকে। ম্লান হাসলেন। কিন্তু বাক্‌রোধ হয়ে গেছে মৃত্যুপথযাত্রীর। কোন কথা বলতে পারলেন না। ধীরে ধীরে বলিরেখাঙ্কিত জরাগ্রস্ত দক্ষিণ হস্তটি সম্প্রসারিত করে দিলেন। তিনি যেন শয্যাপার্শ্বে কিছু খুঁজছেন। কী খুঁজছেন তিনি? সহসা প্রসারিত করাঙ্গুলি স্পর্শ করল তাঁর একমাত্র পার্থিব সম্পদ—আবাল্য-সহচোর আখরোট কাঠের একটি ভিক্ষাপাত্র। কম্পিতহস্তে নির্বাক ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্রটি সম্প্রসারিত করে দিলেন আগন্তুক বৃদ্ধার দিকে।

তার অর্থ কী?

চিন্তিত হয়ে পড়েন ফা-হিয়েন। যুক্তি দিয়ে এ আচরণের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না যে। মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে আজ কী ভিক্ষা চাইতে পারেন মহাজ্ঞানী কুমারজীব—ঐ নতমুখী সর্বহারার কাছে! মার্জনা? করুণা? ক্ষমা?

অক্ষমতীও বিহ্বলা। বুঝে উঠতে পারে না—এ আচরণের কি ব্যঞ্জনা! কী দেবে সে ঐ ভিক্ষাপাত্রে? পশ্চিমদিগন্তলীন দৃপ্ত সূর্য এই শেষ বিদায়-মুহূর্তে কেন অমনভাবে রাঙিয়ে উঠেছেন?

সহসা দৈববাণীর মত ধ্বনিত হল: অগ্‌গবিনতা অক্ষমতী! মহাস্থবির তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছেন না। তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তোমাকেই উপহার

দিচ্ছেন। যে সম্মান আমি পেলাম না, মহাপরিব্রাজক ফা-হিয়েন পেলেন না, মহাঅর্হৎ বুদ্ধভদ্র পেলেন না, মহাভিক্ষু সেন-চাও পেলেন না—সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান তিনি তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছেন। গ্রহণ করে ধন্য হও অগ্‌গবিনতা। তুমি আজ : 'আনন্দ' স্বরূপিণী!

অক্ষমতী বক্তার দিকে ফিরে তাকান। সপ্ততি-বৎসরের এক সৌম্য ভিক্ষু।

কুচীরাজ্যের প্রাক্তন মহাস্থবির : বুদ্ধযশ!

দুই হাত সম্প্রসারিত করে সেই অমূল্য ভিক্ষাপাত্রটি গ্রহণ করেন—'আনন্দ' স্বরূপিণী।

অগ্রসেবক সারিপুত্ত নন, পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামৌদ্‌গল্ল্যায়ন নন, 'আনন্দ' স্বরূপিণী বৃদ্ধা। মুখ লুকালেন ভিক্ষাপাত্রে।

ঝর ঝর করে তাতে ঝরে পড়ে তাঁর চোখ থেকে স্বাতীর মুক্তাবিন্দু!

অশ্রুর অর্ঘ্য!